মাকারিমুল হাফাযাহ্

হাফেযে কুরআনের মর্যাদা

মাওলানা ইমদাদুল্লাহ্

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

মাকারিমুল হাফাযাহ

হাফেযে কুরআনের মর্যাদা

॥ পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ

মাকারিমুল হাফাযাহ
হাফেযে কুরআনের মর্যাদা

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মাওলানা ইমদাদুল্লাহ
মুহাদ্দিস : আল জামিআতুল ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ

সহযোগিতায়
হাবীবুর রহমান
তালিবুল ইলম : আল জামিআতুল ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৫০০৯৮২৪, ০১৭৫৩১৮০৫৫৫

মাকারিমুল হাফাযাহ
হাফেযে কুরআনের মর্যাদা

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মাওলানা ইমদাদুল্লাহ

প্রকাশক
মাওলানা মাহমুদুল হাসান (বড় হুজুর)
মহাপরিচালক : নাদিয়াতুল কুরআন শিক্ষাবোর্ড
প্রতিষ্ঠাতা : নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
মোবা : ০১৯৭৫০০৯৮২৪

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
১৪২৭ হিজরী

পরিমার্জিত সংস্করণ
মার্চ ২০২৪ ঈসায়ী, রমযান ১৪৪৫ হিজরী

অঙ্গসজ্জা
জাগরণ বর্ণসাজ, ০১৪০৮-৮৩৭৮০০

মূল্য
১৪০.০০ (একশ চল্লিশ) টাকা মাত্র

নিবেদন | যুগে যুগে কুরআনের মর্যাদা রক্ষায় যারা জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, সেই সকল শহীদের দারাজাত বুলন্দির আশায়...

–প্রকাশক

প্রকাশকের কথা

কুরআনুল কারীম মহান আল্লাহর অসীম ফযীলতপূর্ণ বাণী, এক অমূল্য রত্ন ভান্ডার। সৃষ্টির সেরা মানবকুলের হিদায়াত লাভের এক প্রদীপ্ত আলোকশিখা। সার্বজনীন এক জীবন বিধান। দুনিয়ার সফলতা ও কল্যাণ, আখেরাতের নাজাত ও মুক্তির শাশ্বত পথ-নির্দেশনা। যুগ যুগ ধরে যার হেফাযতের দায়িত্ব মহান আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'আমি স্বয়ং কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর হেফাযতকারী।' কুরআনুল কারীমের যেখানে তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা এসেছে, সেখানে বলা হয়েছে, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের আল্লাহর গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলের হেফাযতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণে যখন ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা তা হেফাযতের দায়িত্ব পালন করেনি, তখন গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কুরআনুল কারীমের হেফাযতের দায়িত্ব মহান আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। ফলে শত্রুদের শত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সত্ত্বেও এর একটি নুকতা বা যের-যবরে পরিবর্তন আসেনি। কুরআন নাযিলের পর থেকে এ যাবত চৌদ্দশত বছর অতীত হয়ে গেছে, স্বীয় ধর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের ত্রুটি, উদাসীনতা ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কুরআনুল কারীম মুখস্থ করার ধারা পৃথিবীর সর্বত্র পূর্বের মতোই অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখো লাখো; বরং কোটি কোটি মুসলমান, যুবক, বৃদ্ধ এবং বালক-বালিকা এই কুরআনকে বুকে ধারণ করছে। তাদের অসীম মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কিত অসংখ্য উদ্ধৃতি বিদ্যমান।

'মাকারিমুল হাফাযাহ' হাফেযে কুরআনের সেসব মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কিত কুরআন-হাদীসের সেই উদ্ধৃতিসমূহেরই একটি সংকলন।

মর্যাদা ও ফযীলতের পাশাপাশি হাফেযে কুরআনের দ্বারা সংঘটিত কতিপয় চমৎকার ঘটনাও এতে উদ্ধৃত হয়েছে। আরও উদ্ধৃত হয়েছে হাফেযে কুরআনের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ।

আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা প্রতিটি মুসলিম সন্তানকে হাফেযে কুরআন হওয়ার তাওফীক দান করুন। পাশাপাশি এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাত ও মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আমীন।

বিনীত
প্রকাশক

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

ভূমিকা

এ কথা সুস্পষ্ট, কুরআনুল কারীম যেমন আল্লাহ তায়ালার পাক-পবিত্র কালাম, তেমনি যারা এর তেলাওয়াত করেন এবং তদানুযায়ী আমল করেন —তারা আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ও মকবুল বান্দা। এদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তারাই, যারা কালামে পাকের বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য বজায় রেখে আপন বুকে সংরক্ষণ করেছেন। এ কারণেই তারা ورثة القران-এর মুবারক সম্বোধনে সম্বোধিত হয়েছেন। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ মহান কৃতিত্বের বিনিময়ে দুনিয়াতে তারা যেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, তেমনই আখেরাতেও তারা উচ্চাসন ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

এ কথা সর্বজনবিদিত, কোনো জিনিস যতক্ষণ পর্যন্ত সীমাতিক্রম না করে নিজস্ব পরিধির মধ্যে স্বাভাবিক গতিতে বিচরণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির যোগ্য অধিকারী বলে গণ্য করা হয়। এ মূলনীতির আলোকে যদি চিন্তা করা হয়, তবে বাধ্যতামূলক এ কথা বলতেই হবে যে, حامل القرآن (কুরআনের বাহক)-এর উপাধি এবং তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির সত্যিকার অধিকারী ওই সকল হাফেযে কুরআন, যারা হিফয করার সাথে সাথে কুরআনুল কারীমের যাবতীয় আহকাম বা নির্দেশনার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আমল করেন। আর যারা এর ব্যতিক্রম, তাদেরকে বাহ্যত হাফেযে কুরআন বলা হলেও সত্যিকারার্থে তারা এ উপাধির বাইরে। এ কারণেই হাদীস শরীফের যে স্থানে حامل القرآن শব্দ এসেছে, এর অর্থ হাদীস বিশারদগণের নিকট ওই সকল হাফেযগণ, যারা কুরআনুল কারীমের নির্দেশিত বিষয়াদির উপর আমল করেন। উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা হিফয করে কুরআনুল কারীম ও শরীয়তের নির্দেশিত পথে আমল না করেন, তাদেরকে দুনিয়াতে সাময়িকভাবে হাফেয বলা হলেও পরকালে সে হাফেয বলে গণ্য হবে না।

উক্ত আলোচনা সামনে নিয়ে বর্তমান যুগের হাফেযগণের প্রতি লক্ষ করলে অত্যন্ত আফসোস ও অনুশোচনার সৃষ্টি হয়। হৃদয়ে ক্ষোভ ও ঘৃণার সঞ্চার হয়। বাহ্যত হাফেয উপাধি ধারণকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক অঞ্চলে অগণিত-অসংখ্য মনে হলেও বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করলে এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য মনে হয়। এতদ্ব্যতীত আধুনিককালের কিছু মুসলমানদের মন-মানসিকতায় এমন পরিবর্তন ঘটেছে, আপন সন্তানকে হিফয করানো তো দূরের কথা নাজেরা ও মক্তবে পড়ানোকেও তারা সময়ের অপচয় বলে মনে করে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহের দৃষ্টি যদি আমাদের উপর না থাকে, তবে ভয় হয়, অদূর ভবিষ্যতে হিফযে কুরআনের অবশিষ্ট মর্যাদা ও সম্মানের অংশটুকুও বাকি থাকবে না এবং এর ক্রমধারা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

উপরিউক্ত বিষয়সমূহের চিন্তা-ভাবনাই আমার হৃদয়ে কুরআনুল কারীমের আদব ও হিফয করার ফযীলত সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা প্রণয়ন করার আগ্রহ জন্ম দিয়েছে, যা পাঠ করার দ্বারা হিফযে কুরআন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়াদির পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করা যাবে। এর ফলে নিজেই ফায়সালা করে নিতে পারবে হিফয করে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হওয়ার বিষয়টি। আর সাধারণ মুসলমানগণেরও এ বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান হয়ে যাবে যে, যারা হাফেয এবং যারা হিফযরত তাদের কী কী ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে। এতে তারা হাফেয ও হিফযে কুরআনের যথাযথ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে। তাদের অন্তরে হিফযে কুরআনের উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে।

এ উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে আমি এ কিতাবটি ১৩২৫ হিজরীতে প্রণয়ন করি এবং উক্ত হিজরী সংখ্যার সমমান হরফ দ্বারা তার নাম রাখি مكارم الحفظة (মাকারিমুল হাফাযাহ)। আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা রাখি, তিনি এ কিতাবটি কবুল করে আমার জন্য নাজাত ও মাগফিরাতের উপায়, হাফেয সাহেবানদের জন্য সতর্কীকরণ ও উপদেশমূলক বিষয়, আর অন্যান্যদের ক্ষেত্রে হিফয করার অনুরাগ সৃষ্টি করার মাধ্যম এবং হাফেয সাহেবানদের যথাযথ মূল্যায়ন ও মর্যাদা দানে প্রেরণার উৎস হিসাবে গণ্য করবেন।

আমি এ কিতাব প্রণয়নকে নিজস্ব রচনা হিসাবে দাবি করি না। আমি শুধু অনুলেখক বা সংকলক। এজন্যই প্রত্যেক বিষয়ের সাথে সাথে তার উৎস

ও উদ্ধৃতি উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কিতাবের মূল অংশ অনুবাদের সাথে নকল করা হয়েছে। এতে পাঠকদের পুরোপুরি স্থিরতা ও প্রশান্তি লাভ হবে এবং প্রয়োজনে মূল কিতাব দেখে নিতে সহজ হবে। সাধারণত প্রত্যেক কিতাবের হুবহু বিষয়বস্তু ওই স্থান থেকেই চয়ন করা হয়েছে, যা ওই কিতাবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর যে অংশে কোনো কিতাবের প্রাসঙ্গিক বিষয় আনা হয়েছে, সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এ প্রসঙ্গটি অমুক কিতাবের। যাই হোক, সংকলক হিসেবে বিশুদ্ধ সংকলন ব্যতীত অন্য দায়িত্ব আমার উপর নেই। তবে এটা বলে দেওয়া আমার কর্তব্য যে, মূল বিষয়বস্তু, সঠিক অনুবাদ ও বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু বিন্যাসে যদি কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে, তবে অনুগ্রহপূর্বক পাঠকগণ আমাদের অবগত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনী পেশ করে মুদ্রণের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ সাধ্যমতো সংশোধন করাই আমার একান্ত ইচ্ছা। তাওফীকের মালিক আল্লাহ তায়ালা। তাঁর উপরই সকল আশা-ভরসা, সর্বাবস্থায় তাঁর কাছেই মাথা নত করি।

সূচিপত্র

গুরুত্বপূর্ণ ফায়দাসমূহ ১৭
ফায়দা-১ : কুরআনুল কারীম মূলত খুবই কঠিন
তাকে সহজ করা হয়েছে.. ১৭
শাইখ ইসমাঈল সোহরাওয়ার্দী ও জনৈক মূর্খ ব্যক্তির ঘটনা................১৯
ফায়দা-২ : হিফয করা কুরআনুল কারীমের বৈশিষ্ট্য........................২১
ফায়দা-৩ : হিফযে কুরআনের সূচনা.. ২৩
বর্ণনাভেদে ছয়জন ক্বারীর নাম.. ২৪
ফায়দা-৪ : হিফযে কুরআনের শরয়ী হুকুম.. ২৮
ফায়দা-৫ : হিফযে কুরআন ফরয হওয়ার মূল লক্ষ্য........................ ২৯
ফায়দা-৬ : কুরআনুল কারীম দেখে ও মুখস্থ তেলাওয়াত করার হুকুম ২৯
ফায়দা-৭ : তেলাওয়াত না বুঝে পড়লেও সাওয়াব হয়........................ ৩২
ফায়েদা-৮ : হাফেযে কুরআনের উপাধি.. ৩৩
ফায়দা-৯ : হিফয করা যাদের ভাগ্যে জুটে.. ৩৪
ফায়দা-১০ : কুরআনুল কারীম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা................ ৩৫
প্রথম অধ্যায় : হাফেযে কুরআনের ফযীলত ও ঘটনাবলি........................ ৩৭
প্রথম পরিচ্ছেদ.. ৩৭
হাফেযে কুরআনের কবর থেকে কুরআনুল কারীম
তেলাওয়াতের ঘটনা.. ৪৭
কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের বরকতে ভূত পলায়নের ঘটনা.......... ৫১

পবিত্র কুরআনের ওসীলায় সামুদ্রিক বিপদ থেকে
রক্ষা পাওয়ার ঘটনা ৫৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন মনীষীগণের বাণী ও ঘটনাবলি.................৬১
দ্বিতীয় অধ্যায় : হিফযে কুরআনের আদব সম্পর্কিত ৬৯
প্রথম পরিচ্ছেদ : হাফেযে কুরআনের কর্তব্য ৬৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হাফেযে কুরআনের দুটি কথা স্মরণযোগ্য............. ৭২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তেলাওয়াতে অলসতার পরিণাম ৭৩
পাপের কারণে কুরআনুল কারীম ভুলে যাওয়ার ঘটনাসমূহ.............. ৭৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কুরআনুল কারীম কত দিনে খতম করতে হয় ৭৬
যেসকল মনীষী অতি অল্প সময়ে কুরআনুল কারীম খতম করতেন ৭৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল ৮০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : তেলাওয়াতে ইখলাসের গুরুত্ব ৮১
কুরআনুল কারীম দ্বারা বিনিময় গ্রহণ না-করার
অনুকরণীয় ঘটনাসমূহ.. ৮৩
উপসংহার.. দ৮৫
কতিপয় হেদায়েতের বর্ণনা ৮৫
এক. এক বুযুর্গের ঘটনা ৮৬

মাকারিমুল হাফাযাহ

হাফেযে কুরআনের মর্যাদা

গুরুত্বপূর্ণ ফায়দাসমূহ

ফায়দা-১ :
কুরআনুল কারীম মূলত খুবই কঠিন তাকে সহজ করা হয়েছে

কুরআনুল কারীম মূলত কঠিন ও খুব ভারী কালাম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

'আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করব ভারী কালাম।'

হুসাইন ইবনে ফজল রা. উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, কুরআনুল কারীম এমন ভারী কালাম, যার হৃদয় খাঁটি, একত্ববাদে অলংকৃত এবং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ক্ষমতা দানে ক্ষমতাবান, সে ছাড়া অন্য কারো তা বহন করার সাধ্য নেই।[১] এদিকে লক্ষ করলে বুঝা যায়, কুরআনুল কারীম হিফয করাও মূলত কঠিন ব্যাপার নয়; আর বাস্তবেও তাই। শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহে তাঁর প্রিয় বান্দাদের উপর তা সহজ করে দিয়েছেন। যেমন, তিনি ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

'আমি কুরআনুল কারীম সহজ করে দিয়েছি হিফয করার জন্য।'

হযরত হাসান রা. থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি আল্লাহ তায়ালা وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ এ আয়াতটি অবতীর্ণ না করতেন, তবে কারো পক্ষে কুরআনুল কারীমের কোনো শব্দ উচ্চারণ করা সম্ভব হতো না।[২]

---

১. তাফসীরে রূহুল বয়ান, সূরা মুযযাম্মিল।
২. রূহুল বয়ান, সূরা ক্বমার।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'যদি আল্লাহ পাক তাঁর কালামকে বান্দাগণের মুখে উচ্চারণ করা সহজ না করতেন, তবে কেউ কখনো কালামে পাক তেলাওয়াত করতে পারতেন না।'[১]

ইবনে সিরীন রহ. এক ব্যক্তিকে سورة خفيفة বা সহজ সূরা বলতে শুনে ফরমান যে, তুমি سورة خفيفة এর স্থলে سورة خفيفة বা সহজকৃত সূরা বলো। কেননা কোনো সূরা তেলাওয়াত করা সহজ ছিল না; বরং আল্লাহ তায়ালা সহজ করে দিয়েছেন।[২]

হযরত কাজী ইয়াজ রহ. বলেন,[৩]

> منها: تيسيره تعالى حفظه لمتعلمه، وتقريبه على متحفظيه، قال الله تعالى: "وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ" وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم، فكيف الجماعة على مرور السنين عليهم، والقرآن متيسر حفظه للصبيان في أقرب مدة.

> অর্থাৎ, কুরআনুল কারীমের এটাও একটা মুজিযা যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে হিফয করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'আমি কুরআনুল কারীম সহজ করে দিয়েছি হিফয করার জন্য। কেননা, পূর্বেকার উম্মতগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও কোনো একজন ব্যক্তি মুখস্থ করতে পারত না, একটি জামাত তো দূরের কথা। আর কুরআনুল কারীম খুব কম বয়সের ছেলে-মেয়েরা সহজেই মুখস্থ করে নিতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজন বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনা উল্লেখ করা হলো, যারা শৈশবকালে অল্প বয়সে হিফয সম্পন্ন করেছেন।

১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. আট বছর বয়সে কুরআন হিফয করেন।[৪]

---

১. তাফসীরে দুররে মানসূর।
২. তাফসীরে দুররে মানসূর।
৩. শেফাঈ।
৪. হুসনুল মুহাযারা।

২. সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গীর রহ. সাত বছর বয়সে সর্ত কেরাতসহ হিফয করেন।[১]

৩. ইমাম শাফেয়ী রহ. সাত বছর বয়সে হিফয সমাপ্ত করেন।[২]

৪. হযরত সাহল ইবনে তাসতারী ছয় বছর বয়সে হিফয সমাপ্ত করেন।[৩]

৫. কাজী আবু মুহাম্মাদ ইস্পাহানী পাঁচ বছর বয়সে হিফয সমাপ্ত করেন।[৪]

৬. হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. চার বছর বয়সে হিফয সমাপ্ত করেন।[৫]

৭. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তাঁর উস্তায ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নির্দেশে সাত দিনে সমস্ত কুরআনুল কারীম হিফয করেন।[৬]

৮. হিম্মাম ইবনে কালবী রহ. তিন দিনে পুরো কুরআনুল কারীম হিফয করেন।[৭]

এরূপ আরও অগণিত বুযুর্গানে দ্বীন রয়েছেন, যাঁরা অতি অল্প সময়ে হিফয সমাপ্ত করেছেন। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শাইখ ইসমাঈল সোহরাওয়ার্দী ও জনৈক মূর্খ ব্যক্তির ঘটনা

হযরত শাইখ ইসমাঈল সোহরাওয়ার্দী লাহোরী রহ.-এর খেদমতে একদা এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরজ করল, আমার স্ত্রী হাফেযে কুরআন, আর আমি একজন মূর্খ। এজন্য সে তার কাছে যেতে নিষেধ করে এবং বলে যে, আমার অন্তরে আল্লাহ পাকের কালাম রয়েছে সুতরাং তোমার সঙ্গে মেলামেশার দ্বারা কুরআনুল কারীমের বেয়াদবী হবে। তাই আমি নিরুপায় হয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আশা করি, আপনি আমার জন্য এমন দুআ করবেন যেন, আমিও হাফেযে কুরআন হয়ে যাই।

---

১. খাযীনাতুল আসফিয়া।
২. তারীখে খামীস।
৩. খাযীনাতুল আসফিয়া।
৪. শরহে মুসনাদে ইমাম আযম।
৫. কুসতালানী।
৬. রিসালায়ে ওক্বফুন্নবী।
৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফায।

তখন ওই বুযুর্গ বললেন, আপনি আমার নিকট ছয় মাস অবস্থান করুন 'ইনশাআল্লাহ' হাফেযে কুরআন হয়ে যাবেন। বুযুর্গের এ কথা শুনে সে ব্যক্তি ক্রন্দন করতে করতে বলল, 'হযরত! এ ব্যাকুল প্রেমিকের এত ধৈর্য কোথায় যে, ছয় মাস অপেক্ষা করবে। আমি এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি, দুদিনও অবস্থান করতে পারব না।'

তার এ অবস্থা দৃষ্টে সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর কোমল হৃদয়ে রহমতের উত্তাল তরঙ্গমালায় সন্তরণ করতে আরম্ভ করল। তিনি অত্যন্ত বিনম্রমনা হয়ে বললেন, 'আগামীকাল ফজরের নামাযের সালামের পর আমার সামনে ডানদিক দিয়ে উপস্থিত হবে। আল্লাহ্ তায়ালা যদি চান, তবে তুমি তোমার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।' অতঃপর ওই ব্যক্তি তাঁর এ মহৎ বাণীর দিকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে ফজরের সময় মসজিদে উপস্থিত হলো। তার নির্দেশনা মাতাবেক কাজ করল। আল্লাহর কী অপার মহিমা! ওই বুযুর্গ যখনই তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, সাথে সাথে সে হাফেযে কুরআন হয়ে গেল এবং যারা তাঁর ডান পার্শ্বে মূর্খ ছিল, তারাও হাফেযে কুরআন হয়ে গেল। আর যারা বাম পার্শ্বে ছিল, তারা দেখে পড়ার যোগ্যতা লাভ করে ফেলল।

সে ব্যক্তি এ মহান নেয়ামত পেয়ে আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করে ওই বুযুর্গ ব্যক্তির ভক্তে পরিণত হয়ে গেল।

ফায়দা-২ :
হিফয করা কুরআনুল কারীমের বৈশিষ্ট্য

হিফয করা একমাত্র কুরআনুল কারীমেরই স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য। পূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহ হিফয করা সম্ভব ছিল না। তাফসীরে কাশ্‌শাফে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রহ. বলেন, 'কুরআনুল কারীম ব্যতীত অন্যান্য আসমানী কিতাব হিফয করা যেত না।'

হিফয করা কুরআনুল কারীমের বৈশিষ্ট্য হওয়া সম্পর্কে মুফাসসিরিনগণের উক্তি :

كونه محفوظا في الصدور من خصائص القرآن؛ لأن من تقدم كانوا لا يقرءون كتبهم إلا نظرا، فإذا أطبقوها لم يعرفوا منها شيئا سوى الأنبياء، وما نقل عن قارون من أنه كان يقرأ التوراة عن ظهر القلب فغير ثابت.

অর্থাৎ, অন্তরে সংরক্ষণ করা শুধুমাত্র কুরআনুল কারীমের বৈশিষ্ট্য। পূর্বেকার উম্মতগণ তাদের কিতাব শুধু দেখে দেখে পড়ত। যখন তারা কিতাব বন্ধ করে দিত, তখন কারো কোনো কিছু স্মরণ থাকত না একমাত্র নবীগণ ব্যতীত। আর এ কথার কোনো প্রমাণ নেই যে, কারুনের তাওরাত মুখস্থ ছিল।[১]

রবি' ইবনে আনাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

نزلت التوراة وهي وقر سبعين بعيرا يقرأ الجزء منها في سنة، ولم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع بن نون وعزير وعيسى عليهم الصلوة والسلام، والمراد بقوله لم يقرأها يعني لم يحفظها، ويقرأها عن ظهر قلبه إلا هؤلاء الأربعة.

অর্থাৎ, আকাশ থেকে অবতরণকৃত তাওরাত সত্তর উটের বোঝা মতো ছিল। তার একটি অংশ দেখে দেখে পড়তে এক বছর

---

১. রূহুল বয়ান, পারা : ২১, রুকু : ১

লাগত। মূসা আলাইহিস সালাম, ইউশা ইবনে নুন, উযাইর আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম; এ চারজন ব্যতীত অন্য কেউ এ কিতাব পড়েনি। অর্থাৎ এ কিতাব চারজন ব্যতীত অন্য কেউ হিফয করেননি।[১]

নাউফ বাকালী বলেন, যে স্থানে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছিলেন, সে স্থানে আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন, হে মূসা! আমি তাওরাতকে তোমাদের নারী-পুরুষ স্বাধীন, গোলাম, ছোট, বড় সবাইকে মুখস্থ করাব; কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তা প্রত্যাখ্যান করে বলল, 'আমরা তাওরাত কিতাবকে মুখস্থ করতে পারব না, আমরা দেখে পড়তে চাই।'

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর সম্প্রদায়ের উপরিউক্ত উক্তির কারণে আল্লাহ তায়ালার নিকট মুনাজাতের মধ্যে বললেন– হে পরওয়ারদিগার! আমি তাওরাতের মধ্যে এমন এক উম্মতের বর্ণনা পেয়েছি, তাদের কিতাব তাদের অন্তরে থাকবে এবং তারা মুখস্থ পড়বে।

যদি তা লিপিবদ্ধ নাও থাকে, তবু তারা তাদের শরীয়তকে পূর্ণ শক্তি ও যোগ্যতার মাধ্যমে হৃদয়ে সংরক্ষণ করবে। তাওরাতের লিপিবদ্ধ কপিসমূহ যখন মিটে যাবে, তখন আমার শরীয়তের মধ্যে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির আগমন ঘটতে থাকবে।[২]

উম্মতে মুহাম্মাদীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বেকার কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে, صدورهم أناجيلهم অর্থাৎ, তাদের অন্তরসমূহ অবতরণকৃত কিতাবের ন্যায়।[৩]

আরও বলা হয়েছে, قرابينهم نفوسهم আল্লাহ তায়ালা নৈকট্য লাভের উপায় হলো তাদের আত্মা।[৪]

---

১. তাফসীরে খাযেন, ২য় খণ্ড।
২. তাফসীরে রূহুল বয়ান, পারা : ২১, রুকু : ১
৩. ইবনে কাসীর, পারা : ২৯, রুকু : ১
৪. বায়যাভী।

ফায়দা-৩ :
হিফযে কুরআনের সূচনা

এতে কোনো সন্দেহ নেই, কালামে পাক হিফয করার ক্রমধারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কতজন হাফেয ছিলেন। ইমাম গাযালী রহ. ছয়জনের নাম উল্লেখ করেছেন। 'ইহইয়াউল উলুম' কিতাবে লিখেছেন :

وبهذا كان شغل الصحابة رضي الله عنهم في الأحوال والأعمال، فمات رسول الله ﷺ عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم، وكان أكثرهم يحفظ السورة أو السورتين.

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম আমল ও সাধনার মধ্যে তাদের জীবন উৎসর্গ করে ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ হাজার সাহাবী রেখে ইহজগৎ ত্যাগ করেন। যার ফলে বেশিসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম হিফয করতে পারেননি। মাত্র ছয়জন কুরআনুল কারীমে হিফয করেছিলেন। তন্মধ্যে দুজনের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের এক দুটি সূরা মুখস্থ ছিল।

মোটকথা, কালামে পাকের অবতরণ এক এক আয়াত ও এক এক সূরা করে হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে ওহী (ঐশী প্রত্যাদেশ) অবতরণকালে যারা উপস্থিত থাকতেন, তারাই কেবল কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ করে নিতেন। সুতরাং ওহী অবতরণকালে যারা বেশি উপস্থিত থাকতেন, তারাই অধিকাংশ সূরা আয়ত্ত ও লিপিবদ্ধ করেছেন। আর যাদের উপস্থিতি কম হতো, তারা বেশি সূরা আয়ত্ত করতে পারেননি। অতএব, প্রত্যেকের

সম্পূর্ণ কুরআন হিফয না হওয়ার কারণ এটাই ছিল যে, কালামে পাক সম্পূর্ণ একত্রিত ছিল না। নতুবা হিফযের জন্য তাঁদের আগ্রহ কম ছিল না। এ কারণেই কিছু দিন পর যখন সমস্ত সূরা ও আয়াত একত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন সাথে সাথে হাফেযের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং যথেষ্টসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম হিফয করে নিলেন।

বর্ণনাভেদে ছয়জন ক্বারীর নাম

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রা.-এর বর্ণনা অনুযায়ী (১) উবাই ইবনে কা'ব, (২) মা'আজ ইবনে জাবাল, (৩) যায়েদ, (৪) আবু যায়েদ রা.। আর হযরত ইবনে ওমর রা.-এর বর্ণনামতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও হযরত সালেম মাউলা হুযাইফা রা.।

হযরত শা'বী রহ.-এর বর্ণনায় আবু দারদা রা. ও সা'আদ ইবনে উবাইদ রা.-কেও উল্লেখ করেছেন।[১]

হযরত আনাস রা. বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন; অথচ চারজন ব্যতীত অন্য কেউ কালামে পাক হিফয করেননি। কতিপয় ইমামগণ মাত্র চারজন হাফেয হওয়াকে অস্বীকার করেন এবং বিভিন্নভাবে এর জবাব দেন।

কাযী আবু বকর বাকিল্লানী রহ. আট ধরনের জবাব দেন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. উক্ত হাদীস উল্লেখ করে বলেন, হাফেযে কুরআনের সংখ্যা চারের মধ্যে সীমিত শুধু খাওয়ারেজ কওমের আওস নামক গোত্রের মধ্যে, ব্যাপকভাবে সমস্ত এলাকার জন্য নয়। মাযরী রহ. বলেন, হযরত আনাস রা.-এর উক্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, এ চারজন ব্যতীত অন্য কেউ হাফেয হওয়ার ব্যাপারে আমার জানা নেই। নতুবা উক্ত হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ সঠিক হতে পারে না। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম সমস্ত শহর ও কাজের মধ্যে বিস্তৃত ছিলেন। তিনি একাকী সবার সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করা স্বাভাবিকভাবেই কঠিন ছিল। আর যখন হাফেযে কুরআনের এই সংখ্যা শুধু তাঁর ইলম অনুযায়ী ছিল। সুতরাং হতে পারে, বাস্তবিকই আরও হাফেযে কুরআন রয়েছেন তার অজান্তে।

---

১. ইতহাফুস সাদাহ

কুরতুবী রহ. বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন ক্বারী শহীদ হন এবং এ পরিমাণ ক্বারী বীরে মাঊনার ঘটনায়ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে শহীদ হন। সুতরাং উক্ত চারজন হাফেযের সংখ্যা হয়তো এজন্য বলা হয়েছে যে, এই চারজনের সাথে হযরত আনাস রা.-এর বেশি সম্পর্ক ছিল অথবা এ চারজনই তাঁর জানা ছিল।[1]

বুখারী শরীফের শরাহ 'ফাতহুল বারী' নামক গ্রন্থে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত হাদীসের বিভিন্ন জবাব দেওয়ার পরে উল্লিখিত চারজনসহ আরও অনেক ক্বারীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়।

আবু উবাইদা রহ. 'কিতাবুল ক্বিরাত' গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা ক্বারী ছিলেন, তাদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন, মুহাজিরগণের মধ্যে ক্বারী ছিলেন হযরত আবু বকর রা., হযরত ওমর রা., হযরত ওসমান গণী রা., হযরত আলী রা., হযরত তালহা রা., হযরত সা'আদ রা., হযরত ইবনে মাসঊদ রা., হযরত হুযাইফা রা., হযরত সালেম রা., আবু হুরায়রা রা., আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা., আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস রা., হযরত আয়েশা রা., হাফসা রা. ও উম্মে সালমা রা.। আর আনসারদের মধ্যে ছিলেন উবাদাহ ইবনে সামেত রা., মা'আয রা. মাজমা ইবনে জারিযা রা., ফুযালাহ ইবনে উবাইদ রা., মাসলামাহ ইবনে মুখাল্লাদ রা.। তিনি উপরিউক্ত নামসমূহ উল্লেখ করার পর লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর হিফয পরিপূর্ণ করেন।

ইবনে দাউদ রহ. তামীম দারী রা. ও উক্ববাহ ইবনে আমের রা.-কে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবু আমর দারানী রহ. আবু মূসা আশআরী রা.-কে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।[2]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর সময়কালীন সাতশত (কুরআনের বাহক) মুসাইলামাহ কাজ্জাবকে দমন করতে গিয়ে শহীদ হন। 'নিহায়াতুল ইজায ফী সীরাতি সাকিনিল হিজায' গ্রন্থে বর্ণিত আছে :

---

১. তাফসীরে ইতক্বান।
২. তাফসীরে ইতক্বান।

لما تولى الخلافة أبو بكر جهز الجيوش لقتال من ترتد بعد موت النبي ﷺ، ومن جملتها جيش جهزه لقتال مسيلمة الكذاب ومن ارتد معه من العرب، وأمر عليهم خالد بن الوليد المخزومي، فالتقيا وقاتلوا قتالا شديدا، وانهزم المسلمون، وقتل ألف ومائتان منهم سبع مائة حامل القرآن.

হযরত আবু বকর রা. খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর যারা মুরতাদ হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অনেক সেনা অভিযান চালান। তন্মধ্যে একটি অভিযান ছিল মুসাইলামা কাজ্জাব ও তার সহজাত মুরতাদদের বিরুদ্ধে। উক্ত অভিযানে সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ আল-মাখযুমী রা.। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড মোকাবেলার পর মুসলমানগণ পরাজয়বরণ করলেন এবং এক হাজার দুইশত মুসলমান শহীদ হলেন। তন্মধ্যে সাতশতজন ছিলেন حامل القرآن বা কুরআনের বাহক।

উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কেরামগণের কুরআনুল কারীম একত্রিত করার খেয়াল জন্মাল। যেমন, মেশকাত শরীফে উল্লেখ রয়েছে।

এ ছাড়াও হযরত ওমর রা.-এর শাসনকালে শুধু হযরত আবু মূসা আশআরী রা.-এর অধীনে তিনশতেরও অধিক হাফেযে কুরআন ছিলেন। যার বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসবে। সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে হাফেযে কুরআন কম হওয়ার এটিও একটি কারণ ছিল যে, তাঁরা আমল এবং সাধনার প্রতি বেশি মনোযোগী ছিলেন। যেসকল সূরা শিখতেন তার উপর পুরোপুরিভাবে আমল করার চেষ্টা করতেন। যেমন, ইমাম গাযালী রহ. বর্ণনা করেছেন। হেদায়া গ্রন্থের লেখক ইমামতের অধ্যায় লিখেছেন,

أقرؤهم كان أعلمهم؛ لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه.

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে যারা বড় ক্বারী ছিলেন, তারা বড় আলেমও ছিলেন। কেননা তারা কুরআনুল কারীমকে তার আহকামসহ শিখতেন।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর রা. শুধু সূরা বাকারাকেই বারো বছর মুখস্থ করেন। ইবনে ওমর রা. আট বছর মুখস্থ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হিফযে কুরআনের যে মর্যাদা ছিল, তারই সামান্যতম দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি একজন দরিদ্র সাহাবীর কয়েকটি সূরা মুখস্থ থাকার বিনিময়ে তার সাথে একজন মহিলাকে বিবাহ দিয়েছিলেন। এমনিভাবে একজন সাহাবীকে সূরা বাকারা মুখস্থ থাকার কারণে একটি গোত্রের আমীর বানিয়েছিলেন। যেমন, হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে।

সাহাবিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হাফেযে কুরআন কে ছিলেন—তার উল্লেখ এখনো কোনো কিতাবে পাওয়া যায়নি। তবে এতটুকু জানা যায় যে, কুরআনুল কারীমকে আকড়ে ধরার মধ্যে হযরত যায়েদ রা. থেকে কেউ অগ্রগামী ছিলেন না। যেমন, মাজমাউল বিহার গ্রন্থের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ :

أقرؤكم أبي أي قارئكم؛ لأن زيدا لم يتقدمه أحد في إتقان القرآن

> অর্থাৎ, তাঁর ছেলে বর্ণনা করেন, আমার পিতা ক্বারী ছিলেন। কারণ কুরআনুল কারীমকে আকড়ে ধরার মধ্যে তাঁর থেকে অগ্রগামী কেউ ছিলেন না।

মোটকথা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক যুগ থেকে অদ্যাবধি মুসলমানদের মধ্যে উন্নতি ও সমৃদ্ধির সাথে হিফয কুরআনের ধারা চলে আসছে। ইনশাআল্লাহ! কেয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে; কিন্তু বড় আক্ষেপের ব্যাপার! যে বিষয়টি সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে ছিল, সেটি এখন আর নেই। ওই যুগে তারা কুরআনুল কারীমকে ইখলাসের সঙ্গে হিফয করতেন; কিন্তু বর্তমানে তা অনেকেই জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

ফায়দা-৪ :
হিফযে কুরআনের শরয়ী হুকুম

পূর্ণ কুরআনুল কারীম হিফয করা ফরযে কেফায়া ও সুন্নাতে আইন। 'মুনিয়াতুল মুসুল্লী' গ্রন্থের শরাহ্ কাবীরীতে উল্লেখ আছে :

إن حفظ ما يجوز به الصلوة فرض عين على كل مكلف، وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب، وحفظ سائر القرآن فرض كفاية وسنة عين أفضل من صلوة النفل.

যে পরিমাণ কুরআনুল কারীম নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজন, তা মুখস্থ করা প্রত্যেক বিবেকবান প্রাপ্তবয়স্কের উপর ফরযে আইন এবং সূরা ফাতেহাসহ অন্য একটি সূরা হিফয করা ওয়াজিব। সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম হিফয করা ফরযে কেফায়া ও সুন্নাতে আইন, যা নফল নামাযের তুলনায় উত্তম।

'মাযাহেরে হক' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, নামায শুদ্ধ হয়; এতটুকু পরিমাণ কুরআন মুখস্থ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন এবং সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা ফরযে কিফায়া। পৃথিবীর কোনো প্রান্তে যদি কেউ পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেন, তবে অবশিষ্ট সবাই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে এবং সূরা ফাতেহাসহ একটি সূরা মুখস্থ করা সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব।[১]

'মাযাহেরে হক' গ্রন্থে এটাও উল্লেখ আছে, পরবর্তী কতিপয় ওলামায়ে কেরাম ফাতাওয়া দেন যে, অন্য ইলম যা শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া (ফরযে আইন নয়) তার তুলনায় কুরআন হিফয করা উত্তম।

তাহতাবী গ্রন্থে ফরযে কিফায়া এবং সুন্নাতে আইনের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কতিপয় লোকেরা কুরআনুল কারীম হিফয করার দ্বারা প্রত্যেক মুসলমানের উপর সুন্নাতের হুকুম কার্যকর থাকবে। আর যদি কেউ হিফয না করে, তবে সবার উপরে ফরযের দায়িত্ব কার্যকর থাকবে।

---

১. ফাতাওয়ায়ে শামী ও অন্যান্য গ্রন্থে আছে, সূরার দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট সূরা উদ্দেশ্য নয়; বরং কুরআনুল কারীমের যেকোনো তিন আয়াতই যথেষ্ট।

ফায়দা-৫ :
হিফযে কুরআন ফরয হওয়ার মূল লক্ষ্য

কুরআনুল কারীম হিফয করা ফরয হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, তাকে এমনভাবে হেফাযত করা, যাতে কেউ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সুযোগ না পায়।

তাফসীরে বায়যাভী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে :

بل هو بل القرآن آيات في صدور الذين أوتو العلم، يحفظونه لا يقدر أحد على تحريفه.

বরং সম্পূর্ণ আয়াত সম্বলিত কুরআনুল কারীম ওলামাগণের হৃদয়ে সংরক্ষিত, তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার সাধ্য কারো নেই।

ফায়দা-৬ :
কুরআনুল কারীম দেখে ও মুখস্থ তেলাওয়াত করার হুকুম

কুরআনুল কারীম দেখে তেলাওয়াত করা মুখস্থ তেলাওয়াত করার চেয়ে উত্তম। নিম্নবর্ণিত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত :

عن عثمان بن عبد الله أوس الثقفي عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: قراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة، وقراءته في المصحف يضعف على ذلك إلى ألف درجة.

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, কুরআনুল কারীম মুখস্থ পড়ার সাওয়াব এক হাজার গুণ আর দেখে পড়ার সাওয়াব দুই হাজার গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

উক্ত হাদিসটি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার নিমিত্তে বলা হয়েছে। সুতরাং সতর্কতার দৃষ্টিতে হাফেযকে সর্বদা একমাত্র স্বীয় হিফযের ধারণায় কুরআনুল কারীম স্পর্শ করে ও স্বচক্ষে দেখে পড়াকে দোষণীয় মনে না করা উচিত; বরং যথাসম্ভব তা দেখে পড়া উচিত, যাতে কুরআনের ই'রাবসমূহ, ওয়াকফের

প্রকারসমূহ ও সমস্ত মুতাশাবেহাত সর্বদা তার চোখের সামনে থাকে। তবে এর দ্বারা এটা মনে করা অনুচিত হবে যে, দেখে কুরআন পাঠকারীর স্থান হাফেযের ঊর্ধ্বে। কারণ দেখে কুরআন পাঠ করা মুখস্থ পাঠ করার চেয়ে বেশি ফযীলত কতগুলো বাহ্যিক কারণে—কেরাতে আয়াতের কারণে নয়। অর্থাৎ, দেখে কুরআনুল কারীম পড়ার ফযীলত এজন্য বেশি যে, এর দ্বারা কুরআনুল কারীম দেখা, ওঠানো ও স্পর্শ করার সুযোগ হয়। এবং এতে গভীর চিন্তা ও অর্থ উদ্‌ঘাটনে অধিকাংশ শক্তি ব্যয় হয়। কাজেই এ হিসাবে তা উত্তম। নচেৎ যিনি হাফেযে কুরআন তাঁর স্থান জলীলুল কদর (অতি মর্যাদাবান) ফেরেশতা ও নবীগণের সাথে। এ ছাড়াও এ ব্যাপারে ওলামা-গণের যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। এক দলের অভিমত স্বাভাবিকভাবে দেখে পড়াই উত্তম, যা উল্লিখিত হাদীস দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায়।[১]

আর কতকের নিকট স্বাভাবিকভাবে মুখস্থ পড়াই উত্তম। যেমন, 'ইত্তেহাফুয সাদাহ' নামক গ্রন্থের ভাষ্য নিম্নরূপ :

قال السيوطي وحكى الزركشي في البرهان أن القراءة من الحفظ أفضل مطلقا، وابن السلام اختاره؛ لأن فيه من التدبر ما لا يحصل بالقراءة في المصحف (انتهى ملخصا).

আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন, যারকাশী রহ. 'বুরহান' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, 'মুখস্থ পড়া উত্তম দেখে পড়ার চেয়ে এবং ইবনে আবদুস সালাম রহ. তাই পছন্দ করতেন। কারণ গভীর চিন্তা ও ধ্যান যা দেখে তেলাওয়াতের মধ্যে হাসিল হয়, তা মুখস্থ তেলাওয়াতের বেলায় হাসিল হয়।'

মুহাক্কিক্বীন (বিশেষজ্ঞ) ওলামাগণ বলেন, তেলাওয়াতের সর্বোত্তম পন্থা হলো এমনভাবে তেলাওয়াত করা, যার দ্বারা গভীর ধ্যানমগ্নতা অর্জন হয়। এদিকে বিবেচনা করলে তেলাওয়াতে যার ওই অবস্থা বেশি হাসিল হয়, তার জন্যে মৌখিক তেলাওয়াতও বেশি উত্তম। তবে উভয় অবস্থা সমান হলে দেখে পড়া উত্তম।

---

১. তাফসীরে রূহুল বয়ান, পারা : ১২, রুকু : ১

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. মিরকাত নামক গ্রন্থে উক্ত মতানৈক্য এভাবে উল্লেখ করেছেন :

من ههنا أخذ جمع بأن القراءة نظرا في المصحف أفضل مطلقا، وقال آخرون بل غيبا أفضل مطلقا، ولعله عملا بفعله عليه الصلوة والسلام، والحق التوسط، فإن زاد خشوعه وتدبره وإخلاصه في أحدهما فهو الأفضل، وإلا فالنظر.

উক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে কতক ওলামা বলেছেন, কুরআনুল কারীম দেখে তেলাওয়াত করা উত্তম। অন্যরা বলেছেন, শুধু মুখস্থ তেলাওয়াতই উত্তম। সম্ভবত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণেই মুখস্থ তেলাওয়াত করতেন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। অর্থাৎ বিনয়, নম্রতা, গভীর ধ্যানমগ্নতা ও ইখলাস যেভাবে তেলাওয়াত করলে বেশি হাসিল হয়, সেটাই সর্বোত্তম তেলাওয়াত। তবে উভয় অবস্থা সমানকালীন দেখে পড়া উত্তম।

ফায়দা-৭ :
তেলাওয়াত না বুঝে পড়লেও সাওয়াব হয়

কিছু জাহেল লোক মনে করে, অর্থ বুঝা ব্যতীত তেলাওয়াতে কোন সাওয়াব নেই। চাই দেখেই তেলাওয়াত করুক বা মুখস্থ করুক। তাদের এই ধারণা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিমূলক ও ভিত্তিহীন। কারণ, তেলাওয়াত যেভাবেই করুক সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে অর্থ ও উদ্দেশ্য জেনেশুনে তেলাওয়াতে বেশি সাওয়াব হয়।

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. 'মিরকাত' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

> قال ابن حجر: أما الثواب على قراءته فهو حاصل لمن فهم ومن لم يفهم بالكلية للتعبد بلفظه.
>
> অর্থাৎ ইবনে হাজার রহ. বলেন, যে অর্থ বুঝে আর যে অর্থ বুঝে না; উভয়ের তেলাওয়াতে সাওয়াব হাসিল হয়। কারণ কুরআনুল কারীমের শব্দাবলি মুখে উচ্চারণ করাও একটি ইবাদত।

'তাফসীরে ইবনে আদেল' নামক গ্রন্থে হযরত হুযাইফা রা. ও আবু সাঈদ রা.-এর বর্ণনায় একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতির উপর অবশ্যম্ভাবী কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকালীন মক্তবে ছোট্ট শিশুর মুখে যখন শুনেন, الحمد لله رب العلمين। তখন চল্লিশ বছরের জন্য ওই জাতির উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেওয়া হয়।'

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, 'স্বপ্নযোগে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহ! যেসকল পন্থায় আপনার নৈকট্য লাভ করা যায়, তন্মধ্যে সর্বোত্তম পন্থা কোনটি? ইরশাদ হলো, "হে আহমাদ! নৈকট্য পাওয়ার প্রধান মাধ্যম হলো আমার কালাম।" আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ! অর্থ জ্ঞান থাকা শর্ত নাকি তা ব্যতিরেকেই নৈকট্য লাভ সম্ভব? তখন হুকুম হলো, উভয়ভাবেই।"'[১]

---

১. ইহ্ইয়াউল উলূম

বর্ণিত আছে, আবদুর রহমান আসকাফ রহ.-এর নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এক ব্যক্তি তেলাওয়াত করেছে; অথচ সে বুঝে না কী তেলাওয়াত করছে, এরূপ তেলাওয়াতে কোনো প্রতিক্রিয়া হবে কি? তিনি উত্তরে বললেন, এক ব্যক্তি ঔষধ সেবন করছে; অথচ সে জানে না কী সেবন করছে, এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তির মধ্যে ঔষধ কি কোনো ক্রিয়া করবে না? হ্যাঁ, ক্রিয়া করবে, এটাই অবশ্যম্ভাবী। অতএব তাই যদি হয়, তাহলে পাক কালামে কেন ক্রিয়া করবে না? হযরত জালালুদ্দীন রূমী রহ. মসনবী শরীফে লিখেছেন,

باز صندوقی پر از قرآن بہ است

زانکہ صندوقی بود خالی بدست

কতই-না ভালো ওই সিন্দুক, যা কালামে পাকে ভরপুর, আর
কতই-না খারাপ ওই সিন্দুক, যা কালামে পাক থেকে শূন্য।

ফায়েদা-৮ :
হাফেযে কুরআনের উপাধি

হাফেযে কুরআনকে নিম্নোক্ত উপাধিতেও আখ্যায়িত করা হয় :

(১) آل القرآن (আলুল কুরআন); (২) أهل القرآن (আহলুল কুরআন); (৩) صاحب القرآن (সা-হিবুল কুরআন); (৪) جامع القرآن (জা-মিউল কুরআন); (৫) حامل القرآن (হা-মিলুল কুরআন); (৬) واعي القرآن (ওয়াযাঈল কুরআন); (৭) قارئ (ক্বারী)।

হিফযে কুরআনকেও বিভিন্ন শব্দাবলির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যেমন :

(১) جمع (জামাউন); (২) حمل (হামালুন); (৩) وعي (ওয়াউন); (৪) ايعاء (ঈআইন); (৫) إحكام (ইহকামুন); (৬) إظهار (ইযহারুন); (৭) استظهار (ইস্তেয্হারুন)।

উপরিউক্ত উপাধি ও শব্দাবলি হাদীস ও আরবী অভিধান থেকে সংগৃহীত।

ফায়দা-৯ :
হিফয করা যাদের ভাগ্যে জুটে

ইমাম গাযালী রহ. রচিত 'দাক্বাঈকুল আখবার' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, দুনিয়াতে হিফয ওই সকল লোকেরাই করে থাকে, যাদের রূহের মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় প্রত্যক্ষ করেছে। উক্ত কিতাবের মূল শব্দাবলি নিম্নরূপ :

ومنهم من رأى عينيه فصار حافظا لكلام الله تعالى

'যেসকল রূহ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় প্রত্যক্ষ করেছে, তারাই একমাত্র হাফেযে কুরআন হয়েছে।'

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালা ازل এর মধ্যে عقيق سرخ বা লাল বর্ণের মূল্যবান পাথর দ্বারা একটি উজ্জ্বল প্রদীপ তৈরি করলেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরকে পৃথিবীতে আবির্ভাবের আকৃতি ধারণ করিয়ে ওই প্রদীপে রাখলেন। সমস্ত রূহ এর চারপাশে তাওয়াফ করে সত্তর হাজার বছর পর্যন্ত তাসবীহ আদায়ে নিমগ্ন ছিল। এর পরে আল্লাহ তায়ালা সকলকে হুকুম দিলেন—এ প্রদীপের প্রতি তাকানোর জন্য। ওই মুহূর্তে যে রূহ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক দেখেছে, তারাই খেলাফত ও রাজত্বের অধিকারী হয়েছে। যারা তাঁর কপাল মোবারক দেখেছে, তারা ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি হয়েছে। যারা তাঁর ভ্রু মোবারক দেখেছে, তারা চিত্রাঙ্কনকারী হয়েছে। যারা কান মোবারক দেখেছে, তারা সৌভাগ্যবান হয়েছে, আর যারা চক্ষুদ্বয় দেখেছে, তারা হাফেযে কুরআন হয়েছে। এভাবে যারা যে অঙ্গ দেখেছে, তারা এক একজন বিশেষ গুণে গুণান্বিত হয়েছে।[১]

---

১. দাক্বাইকুল আখবার।

ফায়দা-১০ :
কুরআনুল কারীম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা

প্রত্যেক বস্তু যেমন গতানুগতিক রীতি অনুসারে নিঃশেষ হয়ে যায়, তেমনি কুরআনুল কারীম তার দৃশ্যমান কপিসমূহ থেকে এবং হাফেযে কুরআনের হৃদয় থেকে লোপ পাবে। এ বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট ও সর্বজনস্বীকৃত, তাই দলিল-প্রমাণ দ্বারা তা সাব্যস্ত করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই; তবে মনে অতিরিক্ত প্রশান্তি অর্জনার্থে প্রমাণের সাহায্যে বিষয়টি তুলে ধরা হলো।

قال عبد الله بن مسعود: اقرأ القرآن قبل أن يرفع، فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع قبل هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الناس، قال يرى عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم فيصبحون لا يحفظون شيئا.

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কুরআনুল কারীম উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমরা তেলাওয়াত করে নাও। কারণ কুরআনুল কারীম উঠানো ব্যতিরেকে কেয়ামত সংঘটিত হবে না। প্রশ্ন করা হলো, দৃশ্যমান কপিসমূহ থেকে উঠিয়ে নেওয়া তো সম্ভব, কিন্তু মানুষের হৃদয় থেকে কীভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে? তিনি উত্তরে বললেন, মানুষ স্বাভাবিকভাবে রাত্রি বেলায় যখন নিদ্রায় যাবে, তখন তাদের বক্ষ হতে কুরআনুল কারীম উঠিয়ে নেওয়া হবে। ভোর বেলা ওঠে দেখবে কারো কোন কিছু স্মরণ নেই।'[১]

উপরে উল্লিখিত কতিপয় ফায়েদা ভূমিকায় উল্লেখ করা হলো, সামনে দুটি অধ্যায়ে হাফেযে কুরআনের ফযীলত ও আদব সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে।

والله ولي التوفيق، وهو خير رفيق.

'তৌফিকের মালিক আল্লাহ তায়ালা, তিনি উত্তম সঙ্গী।'

১. তাফসীরে খাযেন, পারা : ১৫

প্রথম অধ্যায় :
হাফেযে কুরআনের ফযীলত ও ঘটনাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিম্নোক্ত হাদীসসমূহে ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে-

হাদীস নং : ১

الشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل (عن ابن عباس/ الجامع الصغير)

'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সম্মানি ব্যক্তি তারাই, যারা 'হামেলে কুরআন' (অর্থাৎ কুরআনুল কারীম মোতাবেক আমলকারী হাফেযে কুরআন) এবং তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নফল নামাযে রাত্রিযাপনকারী।'

ফায়দা : 'সিরাজুম মুনীর শরহে জামে সগীর' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, হামেলে কুরআন বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা সার্বক্ষণিকভাবে কালামেপাক তেলাওয়াত করেন এবং কুরআনুল কারীম মোতাবেক জীবনযাপন করে। আর 'আসহাবুল লাইল' দ্বারা ওই সমস্ত ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে, যারা রাত জেগে তাহাজ্জুদ, তেলাওয়াত, ইস্তিগফার, তাসবীহ ইত্যাদি আদায়ে নিমগ্ন থাকেন।

সত্যায়ন : 'দারেমী' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, নাফে ইবনে আব্দুল হারেস আসফান নামক স্থানে হযরত ওমর রা.-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। হযরত ওমর রা. তাকে মক্কার বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। সালাম বাদ হযরত ওমর রা. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মক্কা নগরীতে এখন কাকে বিচারক বানালেন? নাফে উত্তরে বললেন, ইবনে আবযীকে। ওমর রা.

বললেন, কোন ইবনে আবযী? তিনি বললেন, সে আমার স্বাধীনকৃত গোলাম। হযরত ওমর রা. বললেন, তুমি তার উপর মনিবকে হাকীম বানিয়েছ? অতঃপর তিনি বললেন, সে কালামে পাকের ক্বারী এবং যাবতীয় আহকাম সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। হযরত ওমর রা. বললেন, জেনে রাখো! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবের সাহায্যে এক জাতিকে সম্মানিত ও অন্য জাতিকে অপমানিত করবেন।'

উক্ত হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী প্রত্যেকের উচিত হাফেযে কুরআন ও আলেমে দ্বীনকে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানো। যদিও বংশগতভাবে তাঁরা নিম্নস্তরের হোক না কেন।

হাদীস নং : ২

عن أبي ذر أن النبي ﷺ قال لأصحابه: أي الناس أغنى؟ قالوا: أبو سفيان بن حرب، قال آخر: عثمان بن عفان، فقال النبي ﷺ: أغنى الناس حملة القرآن، من جعله الله في جوفه.

হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সবচেয়ে ধনী কোন ব্যক্তি? একজন উত্তরে বললেন, আবু সুফিয়ান, অন্য একজন বললেন, ওসমান ইবনে আফফান রা.।'

তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সবচেয়ে বড় ধনী হল হাফেযে কুরআন, যার হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীম হেফাযত করেছেন।'

ফায়েদা : 'সিরাজুম মুনীর' গ্রন্থে আছে, উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো হামেলে কুরআন। (অর্থাৎ কুরআনের হুকুম মোতাবেক আমলকারী হাফেযে কুরআন) তাঁরই একমাত্র প্রকৃত ধন-সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হাসিল হয়। এটাকেই বলা হয় আত্মার প্রশান্তি বা প্রকৃত ধনাঢ্য হওয়া। দুনিয়ার অত্যধিক ঐশ্বর্য্য, ধন-দৌলতের নাম প্রকৃত ধন নয়।

অথবা তার উদ্দেশ্য হলো, বাস্তবেই 'হামেলে কুরআন' ধন আহরণকারী।

হাদীস নং : ৩

أكرموا حملة القرآن، فمن أكرمهم فقد أكرم الله، إلا فلا نتقضوا حملة القرآن حقوقهم، فإن من الله بمكان كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنه لا يوحى إليهم. (عن ابن عمر/كنز العمال)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা হাফেযে কুরআনকে সম্মান করো। কারণ, যে তাকে সম্মান করল, সে যেন আল্লাহ তায়ালাকে সম্মান করল। সাবধান! হাফেযে কুরআনের অপমান করা কিংবা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে ক্রটি কোরো না। কারণ তাদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রায় আম্বিয়াগণের নিকটতম। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তাদের কাছে ওহী আসে না।'

হাদীস নং : ৪

أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني. (عن ابن عمر/ الجامع الصغير)

তরজমা : হাফেযে কুরআনকে সম্মান করো। যে তাকে সম্মান করল, বস্তুত সে আমাকেই সম্মান করল।

হাদীস নং : ৫

أخرج الطبراني من حديث أنس حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. (تفسير إتقان)

তরজমা : 'তাবারানী' নামক কিতাবে আনাস রা.-এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হাফেযে কুরআন জান্নাতবাসীদের সর্দার।'

হাদীস নং : ৬

حامل القرآن حامل راية الإسلام، ومن أكرمه فقد أكرم الله، ومن أهانه عليه لعنة الله. (عن أبي أمامة/كنز العمال)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হাফেযে কুরআন ইসলামের পতাকাবাহক, যে তাকে সম্মান করল সে বস্তুত আল্লাহ তায়ালাকেই সম্মান করল। আর যে তাকে অসম্মান করল, তার উপর আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত।'

হাদীস নং : ৭

فضل الله حملة القرآن على من لم يحمله كفضل الخالق على المخلوق. (عن ابن عباس/ الجامع الصغير)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হাফেযে কুরআনের মর্যাদা অন্যান্য লোকদের উপর এমন, যেমন স্রষ্টার মর্যাদা সৃষ্টির উপর।'

হাদীস নং : ৮

حملة القرآن أولياء الله، فمن عاداهم فقد عادى الله، ومن والاهم فقد والى الله. (عن ابن عمر/الجامع الصغير)

হাফেযে কুরআন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বন্ধু। যে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে, আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে শত্রুতা পোষণ করবেন। আর যে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে বন্ধুত্ব করবেন।

হাদীস নং : ৯

من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. (عن أنس/كنز العمال)

যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীম হিফয করবে, আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার বিবেক বুদ্ধি সুস্থ রাখবেন।

ফায়েদা : 'তাইসীর শরহে জামে সগীর' কিতাবে বলা হয়েছে, جمع শব্দের দ্বারা 'করা' উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীম মুখস্থ করবে, তার বিবেক সর্বক্ষণ সতেজ ও সুস্থ থাকবে। কখনো নিস্তেজ ও দুর্বল হবে না।

হাদীস নং : ১০

لحامل القرآن دعوة مستجابة. (عن أبي أمامة/كنز العمال)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হাফেযে কুরআনের দুআ কবুল হয়।'

হাদীস নং : ১১

حملة القرآن هم المعلمون كلام الله، والملبسون بنور الله، من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله. (عن علي/كنز العمال)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হাফেযে কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালামের প্রশিক্ষক এবং আল্লাহর নূরে জ্যোতিষ্মান। যে ব্যক্তি তার সাথে বন্ধুত্ব করেছে, আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে বন্ধুত্ব করেছেন। আর যে দুশমনী করেছে, আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে দুশমনী করেছেন।'

ঘটনা : 'তবকাতুল কুবরা' নামক কিতাবে লিখিত আছে, ক্বারী আবু জাফর রহ.-এর যখন ইন্তিকাল হয়, তখন তাঁর বক্ষ ধৌত করার সময় মুদ্রিত কুরআনুল কারীমের একটি পৃষ্ঠার মতো কোনো কিছু দেখা গেল। যেসকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা সকলেই তা দেখে এক বাক্যে বলে ওঠে—নিঃসন্দেহে এটা কুরআনুল কারীমের নূর।

হাদীস নং : ১২

حملة القرآن هم المحققون برحمة الله، الملبسون نور الله، المتعلمون كلام الله، من عاداهم فقد عادى الله، ومن والاهم فقد والى الله، يقول الله عز وجل: يا حملة كتاب الله استجيبوا الله بتوقير كتابه يزدكم حبا، ويحببكم إلى خلقه. (عن عائشة/كنز العمال)

হাফেযে কুরআন আল্লাহ তায়ালার রহমত দ্বারা বেষ্টিত ও তাঁর নূর দ্বারা আলোকিত এবং আল্লাহ তায়ালার কালাম শিক্ষাকারী।

যে ব্যক্তি তাঁর সাথে দুশমনী করে, সে মূলত আল্লাহ তায়ালার সাথে দুশমনী করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে বন্ধুত্ব করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার সাথেই বন্ধুত্ব করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে হাফেযে কুরআন! আল্লাহকে মেনে চলো, তাঁর কিতাবের সম্মান করো, তিনি তোমাদের সাথে ভালোবাসা আরও গভীর করবেন এবং তাঁর সৃষ্টির আপনজন বানিয়ে দেবেন।'

হাদীস নং : ১৩

في الجنة نهر يقال له الريان عليه مدينة من مرجان لها سبعون الف باب من ذهب وفضة لحامل القران. (عن عبن عباس/ كنز العمال)

জান্নাতের একটি নদী আছে, যার নাম 'রাইয়ান' তার উপর মারজানের একটি শহর রয়েছে, যার সত্তর হাজার দরজা স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত। এটাই একমাত্র হাফেযে কুরআনের জন্য নির্ধারিত।

হাদীস নং : ১৪

يا حملة القرآن! إن اهل السماوات يذكرونكم عند الله فتحببوا إلى الله بتوقير كتابه ليزداد لكم حبين، ويحببكم الى عباده. (صحيحين. كنز)

হে হাফেযে কুরআন! আকাশবাসী (ফেরেশতারা) আল্লাহ তায়ালার দরবারে তোমাদের আলোচনা করেন। তোমরা আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র হও, তাঁর কালামকে সম্মান করো, যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে ভালোবাসা গভীর করেন এবং তিনি তোমাদেরকে সর্বসাধারণের নিকট প্রিয়পাত্র করে দেন।

হাদীস নং : ১৫

الحدة تعترى جماع القرآن في أجوافهم. (فر/ كنوز الحقائق)

ইসলামী চেতনা ও ধর্মীয় অনুভূতি তাদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়, যারা নিজেদের বক্ষে কুরআনুল কারীম একত্রিত করে রেখেছেন।

ফায়দা : 'জামে সগীর' কিতাবের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে,

ليس أحق بالحدة من حامل القرآن لعزة القرآن في جوفه.

'ধর্মীয় তীক্ষ্ণ অনুভূতি হাফেযে কুরআন ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে এত বেশি উদয় হয় না।'

'সিরাজুল মুনীর শরহে জামে সগীর' কিতাবে লেখা হয়েছে, ধর্মীয় এ চেতনা ওই সময়ই উদয় হয়, যখন শরীয়ত-বিরোধী কোনো কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়।

হাদীস নং : ১৬

عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: من تعلم القرآن فاستظهر وحفظه، أدخله الله الجنة، وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. (مسند الإمام أحمد)

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীম এমনভাবে শিক্ষা করে যে, সে তা মুখস্থ পড়তে পারে, আল্লাহ তায়ালা ওই ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন। তারই পরিবারস্থ এমন দশজন লোকের ব্যাপারে, যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছিল।'

ফায়দা : মিশকাত শরীফে আরও কিছু শব্দ অতিরিক্ত আছে। যথা :

إذا عمل به فأحل حلاله وحرم حرامه.

'উক্ত ফযীলতের অধিকারী তখনই হবে, যখন হিফয করার সাথে সাথে তদানুযায়ী আমল করে এবং তার হালাল করা জিনিসকে হালাল ও হারাম করাজিনিসকে হারাম মনে করে।'

হাদীস নং : ১৭

في الحديث من استظهر القرآن خفف عن والديه العذاب، وإن كانا مشركين. (روح البيان)

হাদীসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীম হিফয করে তার পিতামাতার আযাব হালকা করে দেওয়া হয়, যদিও তারা মুশরিকই হোক না কেন।'

হাদীস নং : ১৮

عن معاذ الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. (مشكاة)

মু'আজ জুহানী রা. বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করে এবং তদানুযায়ী আমল করে, তার পিতামাতাকে কেয়ামতের দিন এমন মুকুট পরিধান করানো হবে, যার আলো দুনিয়ার ঘরে থাকাকালীন সূর্যের আলোর চেয়েও অধিক আলোকময়। অন্য লোকের যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে কুরআনুল কারীম মোতাবেক আমলকারীর অবস্থা সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা?'

ফায়দা : হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, উক্ত হাদীসে قرأ القرآن (কুরআন পড়া) দ্বারা হিফয করা উদ্দেশ্য। (মিরকাত)

হাদীস নং : ১৯

ألا أدلكم على الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء من قبلي، هم حملة القرآن والأحاديث عني وعنهم في الله والله. (الجامع الصغير)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি কি আমার ও আমার সাহাবিদের এবং পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের খলীফাগণ

সম্পর্কে তোমাদের কাছে কিছু বলব না? তাঁরা এমন লোক, যাঁরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরআনুল কারীম হিফয করে এবং তদানুযায়ী আমল করে। আর আমার ও তাদের বাণীসমূহ বর্ণনা করে।'

হাদীস নং : ২০

من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، لا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد في من حد، ولا يجهل مع من يجهل، وفي جوفه كلام الله. (عن ابن عمر/كنز العمال)

যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীম পড়েছে, সে তার বাহুর মাঝে নবুওয়াত প্রবেশ করিয়েছেন। কিন্তু তার উপর ওহী অবতীর্ণ হয় না। হাফেযে কুরআনের উচিত নয় নিজের বক্ষে কুরআনুল কারীম রেখে বদমেজাজ লোকদের সাথে বদমেজাজী করা এবং মূর্খ লোকদের সাথে মূর্খতা করা।'

ফায়দা : উক্ত হাদীসে 'পড়েছে' শব্দের অর্থ হলো হিফয করেছে, যা দ্বিতীয় বাক্য ও পূর্বোল্লিখিত ৩ নং হাদীস দ্বারা বুঝা যায়।

হাদীস নং : ২১

يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة، حتى يقرأ آخر شيء معه. (ابن ماجه)

হাফেযে কুরআন যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, তেলাওয়াত করো এবং আরোহন করো। সে তেলাওয়াত করতে থাকবে শেষপর্যন্ত যা তার মনে আছে আর এক এক দরজা উপরে আরোহণ করতে থাকবে।

ফায়দা : হাফেয ইবনে হাজার রহ. উক্ত হাদীসের صاحب القرآن শব্দ দ্বারা বিশেষ হাফেযে কুরআন উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তার এ মতের উপর কয়েকটি প্রমাণও পেশ করেছেন, যা 'মিরকাত' গ্রন্থে লেখা হয়েছে।

'দলীলুল ফালেহীন শরহে রিয়াযুস সালেহীন' কিতাবে লেখা হয়েছে যে, উক্ত হাদীসে সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীমের হাফেয ও কিছু সূরার হাফেয উভয়েরই ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে– এর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই; তবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, অসম্পূর্ণ হাফেয পরিপূর্ণ হাফেযের মর্যাদার সমান হতে পারবে না।

'কানযুল উম্মাল' কিতাবে উক্ত হাদীসের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কুরআনুল কারীমের আয়াত সমতুল্য জান্নাতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যে হাফেযে কুরআন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার উপরের স্তরে আর কেউ যেতে পারবে না।

হাদীস নং : ২২

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله عز وجل قرأ طه ويس قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. (رواه الدارمي/مشكوة)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিন সৃষ্টি করার এক হাজার বছর পূর্বে সূরায়ে 'ত্বহা' ও সূরা 'ইয়াসীন' তেলাওয়াত করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তা শুনে বলতে লাগলেন, সুসংবাদ ওই উম্মতের প্রতি, যাদের উপর তা অবতীর্ণ হবে। সুসংবাদ ওই সমস্ত হৃদয়ের প্রতি—যে হৃদয় তা মুখস্থ করবে। সুসংবাদ ওই সমস্ত জিহ্বার প্রতি, যে জিহ্বা তা তেলাওয়াত করবে।

হাদীস নং : ২৩

عن أبي هريرة رضـ قال: قال رسول الله ﷺ: طوبى لمن يبعث يوم القيامة وجوفه محشوّ بالقرآن والفرائض والعلم. (كنز)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যাকে কেয়ামতের

দিন উঠানো হবে আর তার হৃদয় কুরআনুল কারীম ও শরীয়তের নির্দেশাবলি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকবে।’

হাদীস নং : ২৪

إن الله تعالى ليغضب فتسلم الملائكة لغضبه، فإذا نظر إلى حملة القرآن تملأ رضا. (عن ابن عمر/كنز العمال)

আল্লাহ তায়ালা যখন রাগান্বিত হন, তখন ফেরেশতাগণ নতজানু হয়ে থাকেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা যখন হাফেযে কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দেন তখন খুবই আনন্দিত হন।

হাদীস নং : ২৫

إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكلي لحمه، قالت: إلهي! كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه. (عن جابر/كنز العمال)

হাফেযে কুরআন যখন ইন্তেকাল করে, তখন আল্লাহ তায়ালা যমীনকে হুকুম দেন তার গোশত ভক্ষণ কোরো না। যমীন তখন বলে উঠে, হে আল্লাহ! আমি তার গোশত কেমনে ভক্ষণ করব; অথচ তার হৃদয়ে রয়েছে তোমার পবিত্র কালাম।

উল্লেখ্য, হাফেযে কুরআনের কবর থেকে তেলাওয়াতের আওয়াজ শোনা যায়। এ ধরনের ঘটনাবলিকে উক্ত হাদীস সত্যায়ন করেছেন। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো :

হাফেযে কুরআনের কবর থেকে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের ঘটনা

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ‘আখবারুল আখয়ার’ নামক কিতাবে শাইখ মুহাম্মাদ তুরক নারেনূলী রহ.-এর আলোচনায় লিখেছেন, সেখানে দুটি কবর রয়েছে। একটি উঁচু জায়গায়, অপরটি নিচু জায়গায়। এজন্য একটিকে বলা হয় উঁচু শহীদ, অপরটিকে বলা হয় নিচু শহীদ। এ উভয়জন শহীদই হাফেযে কুরআন ছিলেন। বলা

হয়ে থাকে, কিছু বুযুর্গ তাঁদের কবর থেকে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনেছেন—যা দওরের নিয়মে ছিল।

'খাযীনাতুল আসফিয়া' কিতাবের লেখক শাইখ রুজেভান রহ.-এর আলোচনায় লিখেছেন, শাইখ আবু তাহের যিনি শাইখ রুজেভান রহ.-এর সাথি ছিলেন। তিনি বলেন, আমি এবং শাইখ রুজেভান রহ. প্রত্যেক দিন প্রত্যুষে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতাম। যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন, তখন পৃথিবী আমার দৃষ্টিতে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছিল। একদিন রাত্রের শেষাংশে উঠে পড়লাম অতঃপর শাইখের কবরের শিয়রে বসে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতে লাগলাম; কিন্তু একাকিত্ব ও নির্জনতার কারণে হঠাৎ আমার ক্রন্দন এসে গেল। এ অবস্থায় আমি শায়খের কবর থেকে কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত শুনতে পেলাম। মানুষ না আসার পূর্বপর্যন্ত পর্যায়ক্রমে শুনে যাচ্ছিলাম। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। কিন্তু আমার এক বন্ধুর নিকট যখন তা ব্যক্ত করলাম, তখন থেকেই তেলাওয়াতের আওয়াজ আসা বন্ধ হয়ে গেল।

'মাআসিরুল কেরাম' কিতাবের লেখক 'আখবারুল আসফিয়া' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, হাফেয মাহমুদ বলগ্রামী রহ. তাঁর সময়কার বিশিষ্ট বুযুর্গ ও একক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। নশ্বর জগতে ত্যাগ করে যখন অবিনশ্বর জগতে তাশরীফ নিলেন, তখন তার নূরান্বিত কবরস্থান হতে প্রত্যেক জুমার রাতে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের আওয়াজ ভেসে আসত, যা বুযুর্গ ব্যক্তিগণ শুনতে পেতেন।

হাদীস নং : ২৬

أخرجه الديلمي من حديث علي رضـ: حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. (تفسير إتقان)

দায়লামী রহ. আলী রা. বর্ণনা নকল করেছেন, যেদিন আল্লাহ তায়ালার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন হাফেযে কুরআন আল্লাহ তায়ালার ছায়াতলে স্থান পাবে।

ফায়দা : 'জামে সগীর' কিতাবে হযরত আলী রা.-এর বর্ণনায় এ হাদীসটিও নকল করা হয়েছে যে, নিজের সন্তানকে তিনটি কথা শিক্ষা দাও :

১. নবীকে মহব্বত করা।

২. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরগণকে মহব্বত করা।

৩. কুরআনুল কারীম হিফয করা। কারণ, হাফেযে কুরআন আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার ছায়াতলে থাকবেন।

হাদীস নং : ২৭

عن أبي هريرة رضـ عن النبي ﷺ قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب! رده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة. (هذا حديث حسن، ترمذي)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন হাফেযে কুরআন আসবে তারপর কুরআনুল কারীম আল্লাহর দরবারে বলবে, হে প্রভু! তাকে হুল্লা পরিধান করান। অতঃপর তাকে সম্মানের মুকুট পরিধান করানো হবে। আবার বলবে, আরও বেশি পরিধান করান। অতঃপর তাকে হুল্লা পরিধান করানো হবে। এরপর আবার কুরআনুল কারীম বলবে, হে প্রভু! তার উপর আপনি সন্তুষ্টি হয়ে যান। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার উপর সন্তুষ্টি হয়ে যাবেন। তারপর বলা হবে তেলাওয়াত করো এবং উপরে আরোহণ করতে থাকো। প্রতি আয়াতের পরিবর্তে তাকে অতিরিক্ত একটি করে নেকী দেওয়া হবে।

হাদীস নং : ২৮

من أعطاه الله حفظ كتابه فظن أن أحدا أعطى أفضل مما أعطى فقد غلط أفضل النعمة. (عن رجاء الغنوي مرسلا/كنز العمال)

আল্লাহ তায়ালা যাকে তার কিতাব হিফয করার তৌফিক দিয়েছেন, সে যদি ধারণা করে যে, অন্যজনকে এর চেয়েও বেশি ভালো

জিনিস দান করা হয়েছে, তাহলে তার সর্বোত্তম নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করা হবে।

ফায়দা : 'মাকাসিদুস সালেহীন' কিতাবে লেখা হয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীম হিফয করে একথা ভাবে যে, এর চেয়েও ভাল বস্তু অন্য কাউকে দেওয়া হয়েছে, তাহলে সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

হাদীস নং : ২৯

حامل كتاب الله تعالى له في بيت مال المسلمين في كل سنة مائتا دينار. (عن سليك الغطفائي/كنز)

মুসলমানদের ধন-ভান্ডার হতে হাফেযে কুরআনের বার্ষিক ভাতা হলো দুইশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)।

ফায়দা : তাইসীরে শরহে জামে সগীর কিতাবে লেখা হয়েছে, উল্লিখিত স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ তার যথেষ্ট হওয়ার অনুপাতে নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি তা যথেষ্ট না হয়, তাহলে প্রয়োজনানুপাতে তা বৃদ্ধি করা হবে। আর যদি উল্লিখিত পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়, তবে তা থেকে কমানো হবে।

সত্যায়ন : 'খাযানাতুর রিওয়াত' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, دستور القضاة (বিচার নীতি) এর باب المتفرقات (ভিন্নধর্মী বিষয়াবলির অধ্যায়) এর মধ্যে بستان أبو الليث থেকে বর্ণিত আছে 'হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম হিফয করে, তার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে ভাতা হবে দুইশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা এক হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বা পাঁচশত দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)।

'আকদুল লাআলী ওয়া মুলতাকিতুন নাসিরি' কিতাবে লেখা হয়েছে, হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন, প্রত্যেক ক্বারীর জন্য বার্ষিক ভাতা হলো দুইশত স্বর্ণমুদ্রা বা এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা। যদি দুনিয়াতে তা পেয়ে যায়, তাহলে তো ভালোই। আর যদি না পায়, তাহলে পরকালে এর বদলা মিলবে।

'ফাতাওয়ায়ে কামেল' নামক কিতাবে লিখিত আছে, প্রত্যেক আলেমে দ্বীন ও হাফেযে কুরআনের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে বার্ষিক দুইশত

দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা এক হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) প্রদান করা হবে। যদি সরকার তা দুনিয়াতে আদায় না করে, তবে পরকালে তাঁর নেকী দ্বারা তা আদায় করা হবে। যদি নেকী না থাকে, তবে পাপের বোঝা তার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

'তারীখে খামীস' কিতাবে লিখিত আছে, খলীফা ওলীদ বিন আবদুল মালিক হাফেযে কুরআনের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন এবং তাদের পক্ষ থেকে তাদের কৃত ঋণ আদায় করে দিতেন।

হাদীস নং : ৩০

أهل القرآن أهل الله وخاصته. (ابن ماجه)

আহলে কুরআন আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম বন্ধু ও বিশেষ বান্দা।

ফায়দা : 'জামে সগীর' কিতাবে নিম্নোক্ত শব্দাবলির দ্বারা এক হাদীস রয়েছে : آل القرآن آل الله (আহলে কুরআন বস্তুত আল্লাহ তায়ালারই আহল ও বিশেষ লোক।)

'সিরাজুল মুনীর শরহে জামে সগীর' কিতাবে বলা হয়েছে, آل القرآن -এর অর্থ হলো, ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী আমলকারী হাফেযে কুরআন, আর آل الله এর অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালার ওলী বা প্রিয় বান্দা।

হাদীস নং : ৩১

حامل القرآن موقى. (عن عثمان/الجامع الصغير)

হাফেযে কুরআন মাহফুজ বা আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তায়।

ফায়দা : 'শরহে জামে সগীর' গ্রন্থে লেখা হয়েছে, প্রত্যেক দূর দৈর্ঘ্য অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাবলি ও যাবতীয় বিপদাপদ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা প্রাপ্ত হলো হাফেযে কুরআন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাকে ব্যথিত করবে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন।

কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের বরকতে ভূত পলায়নের ঘটনা

মহা পরিব্রাজক ও বিশ্ব পর্যটক ইবনে বতুতা তার প্রসিদ্ধ সফরনামা 'মহা ভারতের দক্ষিণ দীপপুঞ্জ'-এর আলোচনায় একটি দ্বীপের ঘটনা উল্লেখ

করেছেন। তিনি লিখেছেন, সেখানকার অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের প্রকৃত ঘটনা, যা সে স্থানেরই কতক সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকে শুনেছি। তা হলো এই—সেখানকার অধিবাসীরা যখন কাফের ছিল, তখন প্রত্যেক মাসে তারা একটি ভূত দেখতে পেত, যা ওই সাগর দিয়েই আসত। ভূতটির আকার ছিল জাহাজের ন্যায়, এর উপর থাকত অগণিত-অসংখ্য জ্বালানো প্রদীপ। তাদের নিয়ম ছিল এই যে, তারা সেটি দেখামাত্রই একজন কুমারীকে উত্তম পোশাক পরিধান করিয়ে, সমুদ্রের তীরে একটি ভূতখানায় রেখে চলে আসত—যার জানালা সমুদ্রের দিকেই ফেরানো ছিল। ভোরে সেখানে গিয়ে তারা শুধু কুমারীর মৃত দেহটা দেখতে পেত। প্রাচীনকাল থেকেই এ প্রথা চলে আসছিল। অগণিত-অসংখ্য কুমারীকে এভাবেই প্রাণ বিসর্জন দিতে হতো। এরই মধ্যে একদিন সেখানে আরবের অধিবাসী আবুল বারাকাত বরবরী নামীয় এক ব্যক্তি এলেন, যিনি অত্যন্ত বড় ওলী, বুযুর্গ ও হাফেযে কুরআন ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি মালদ্বীপের এক বৃদ্ধা মহিলার বসতিতে আশ্রয় নিলেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন ওই ঘরের পরিচালিকা বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে আরও কতিপয় মহিলা ক্রন্দন করছে। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, এ অভাগিনীর একমাত্র কুমারীকে ভূতের জন্য উৎসর্গ করে দেওয়ার সময় এসেছে। তখন হাফেয আবুল বারাকাত (যার দাড়ি তখনও গজায়নি) বৃদ্ধাকে বললেন, 'আপনি চিন্তিত হবেন না, আপনার মেয়ের পরিবর্তে আমি নিজেই ভূতের নিকট যাব। ভূত যদি আমাকে নিয়ে যায়, তাহলে আপনার মেয়ে বেঁচে যাবে। আর যদি আমাকে না নেয়, তাহলে তো এ দ্বীপের সমস্ত অধিবাসী এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাবে।'

এরপর লোকেরা ওই কুমারীর পরিবর্তে হাফেয আবুল বারাকাতকে নিয়ে সেখানে রেখে এলো। তিনি একাকী ওই ভূতখানার জানালার কাছে গিয়ে বসে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত আরম্ভ করলেন। অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করতে করতে যখন ওই ভূত আসতে লাগল, তখন হাফেয আবুল বারাকাতকে দেখে তৎক্ষণাৎ ভূত পলায়ন করল। আর তিনি ভোর পর্যন্ত তেলাওয়াতেই নিমগ্ন থাকলেন।

ভোরবেলা ওই বৃদ্ধা আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য লোক নিয়ে সেখানে গেল,

যাতে প্রচলিত প্রথানুযায়ী মৃতদেহ বের করে চিতায় দেওয়া হয়। কিন্তু যখন তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতে মগ্ন পেল, তখন তারা খুবই আশ্চর্য বোধ করল। পরিশেষে ওই বৃদ্ধা এ সংবাদ রাজন্যবর্গ পর্যন্ত পৌঁছালে সম্রাট অতি আগ্রহচিত্তে তাকে ডেকে নিয়ে পূর্ণ বৃত্তান্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন।

এ ঘটনা থেকে সম্রাট ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন হলেন। হাফেয আবুল বারাকাত ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি বর্ণনা করে বললেন, আপনি আরও এক মাস আমাদের এখানে অবস্থান করুন। যদি আগামী মাসেও ভূত না আসে অথবা আসার পর আপনি তাকে পুনরায় পলায়নে বাধ্য করতে পারেন, তাহলে আমি ইসলামে দীক্ষিত হব। আল্লাহ তায়ালা এভাবেই রাজা প্রজাকে ইসলামের জন্য তৈরি করে নিলেন। পরিশেষে পরের মাসেও হাফেয আবুল বারাকাতকে আবার ওই ভূতখানায় নিয়ে যাওয়া হলে আগের মতোই লোকেরা তাকে সুস্থ সবল ও কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতে মগ্ন পেল। এরপর দ্বীপবাসী সমস্ত মূর্তিদেবতা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল এবং ওই ভূতখানাকেও মাটির সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দিল। অতঃপর রাজাপ্রজা নির্বিশেষে সকলেই মুসলমান হয়ে গেল। এ এলাকার লোক ইমাম মালেক রহ.-এর অনুসারী। আজ পর্যন্ত এ মাযহাবই তাদের মাঝে পরিচিত।

ইবনে বতুতা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এ দ্বীপে আমি অবস্থান করছিলাম; কিন্তু তাদের কোনো ইতিহাস আমার জানা ছিল না। হঠাৎ এক রাতে আমি তাদেরকে দেখলাম উচ্চৈঃস্বরে হামদ ও সানা পড়তে পড়তে এবং কুরআনুল কারীম শিরোধার্য করে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, তারা ওই রাতের স্মরণে তা পালন করছে, যে রাতে তারা হাফেয আবুল বারাকাতের সাহায্যে মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। অতঃপর তারা ওই সময়ই আমাকে উল্লিখিত ঘটনা শোনাল।

এক মাস পর যখন ওই রাত আসে, তখন তারা সমুদ্রের তীরে একত্রিত হয়ে সারা রাতব্যাপী কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতে মগ্ন থাকে এবং অনেক দান-খয়রাতও করে থাকে।

'হাবীবুস সীয়ার' গ্রন্থের উপসংহারে উল্লেখ রয়েছে, কবরস্ নামক দ্বীপে একটি ভূতখানায় বড় আকারের একটি মূর্তি ছিল। প্রতিমা পূজারীদের

বিশ্বাস মতে এ মূর্তিটি বছরান্তে একটি মানব বলি চায়। এ কারণেই তারা কোনো নিঃস্ব ও অসহায় গরিব লোককে ধরে ওই ভূতখানায় আটক রাখত। ভোরবেলা দ্বারা উন্মোচন করে তার মৃতদেহটি শুধু দেখতে পেত।

'আজাঈবুল বুলদান' গ্রন্থের লেখক বলেন, ৭০০ হিজরীতে এক পথিক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সেখানে এসেছিলেন, গতানুগতিক কীর্তি অনুযায়ী তাকেও প্রতিমা পূজকরা ওই ভূতখানায় আবদ্ধ করে ফেলল। পথিক হাফেযে কুরআন ছিলেন। সারা রাতব্যাপী তিনি তেলাওয়াত করলেন। ভোরবেলা প্রতিমা পূজকরা ভূতখানার দ্বার উন্মোচন করে জীবিতাবস্থায় তাঁকে দেখতে পেল।

এ ঘটনায় তারা খুবই পেরেশানী বোধ করল। সকলেই বলতে লাগল, আমাদের মাবুদ তাকে হত্যা করেনি। অতঃপর সবাই তাকে আনন্দচিত্তে মণিমুক্তাসহ বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে বরণ করে নিল। এ পথিক তাদের মধ্যে খুব প্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে স্থান লাভ করলেন। তিনি যা বলেন, তাই তারা মেনে চলেন।

পবিত্র কুরআনের ওসীলায় সামুদ্রিক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা

'মুসলিমে সফফার' লেখেন, এক ব্যক্তি বর্ণনা করল যে, আমরা কতক সাথি সমুদ্রের মধ্যে ছিলাম, চতুর্দিক থেকে উত্তাল তরঙ্গমালা আমাদের বেষ্টন করে ফেলল; মানুষ ভয়ে বিপদে আতঙ্কিত প্রকম্পিত হয়ে চিৎকার করতে আরম্ভ করল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি কুরআনুল কারীম মাথায় রেখে আকাশ পানে তাকিয়ে বলতে লাগল,

أتغرقنا في البحر ومعنا كلام الله

'হে আল্লাহ! তুমি কি আমাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবে! অথচ আমাদের সাথে রয়েছে তোমার পবিত্র কালাম।'

আল্লাহর কী অপার মহিমা! সমুদ্র শান্ত হয়ে গেল। হাফেযে কুরআন সমস্ত বিপদাপদ থেকে মুক্ত—উল্লিখিত ঘটনাই এর বাস্তব প্রমাণ। কেননা হাতে কুরআনুল কারীম থাকাকালীন যেহেতু নাজাত পেয়ে গেল, তাহলে যার হৃদয়ে কুরআনুল কারীম মুদ্রিত রয়েছে, সে তো নাজাত পাওয়ার অধিক উপযুক্ত।

হাদীস নং : ৩২

في شرح السنة عن أبي أمامة: احفظوا القرآن، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. (مرقات)

‘শরহুস সুন্নাহ’ কিতাবে হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে, তোমরা কুরআনুল কারীম মুখস্থ করো। কারণ আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দেবেন না ওই হৃদয়কে, যা কুরআনুল কারীম সংরক্ষণ করেছে।

হাদীস নং : ৩৩

لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. (عن أبي هريرة/كنز)

যদি কুরআনুল কারীম চামড়ার মধ্যে জমা করা হতো, তবে আল্লাহ তায়ালা তা আগুন দ্বারা ভস্ম করে দিতেন না।

ফায়দা : ‘মিরকাত’ কিতাবে লেখা আছে, দেহের চামড়ায় কুরআনুল কারীম সংমিশ্রিত হওয়ায় যেহেতু আগুন থেকে নাজাত পাওয়া ও মহামুক্তির অধিকারী হওয়া যায়, তাহলে হাফেযে কুরআনের অন্তর এবং তদনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তির দেহের মূল্যায়ন কেমন হবে?

যার মধ্যে কুরআনুল কারীমের প্রতিকৃতি বছরের পর বছর অবশিষ্ট থাকে, সে তো মুক্তির পাওয়ার বেশি উপযোগী।

‘আশিআতুল লুমআত’ নামক কিতাবে বলা হয়েছে, চামড়া না জ্বলার মুজিযা প্রত্যেকের হাতেই প্রকাশ পায় না। কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, ‘উক্ত মুজিযা শুধু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়েই ছিল। “আগুন” দ্বারা কতক ওলামায়ে কেরামের নিকট দোযখের আগুন উদ্দেশ্য।’

তাফসীরে ইতক্বানে উল্লেখ আছে, إهاب (চামড়া) দ্বারা মুমিনের হৃদয় বুঝানো হয়েছে।

হাদীস নং : ৩৪

في بعض الآثار: ما حسدت اليهود والنصارى على شيء كحفظ القرآن. (روح البيان)

ইহুদী খ্রিষ্টানদের অন্তর্জ্বালা ও দেশ-বিদেশ হিফযে কুরআনের দ্বারা যতটুকু বর্ধিত হয়, অন্য কোনো জিনিসের দ্বারা ততটুকু হয় না।

হাদীস নং : ৩৫

عن أبي سعيد الخدري رضــ قال: قال رسول الله ﷺ: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. (مشكوة)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্ তায়ালা ফরমান, কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত আমার যিকির ও প্রার্থনা থেকে যাকে বিরত রেখেছে, আমি তাকে প্রার্থনাকারীর চেয়েও বেশি পুরস্কৃত করব।'

ফায়দা : 'মিরকাত' কিতাবে বলা হয়েছে, 'কুরআনুল কারীম বিরত রাখে'-এর অর্থ হলো, কুরআনুল কারীম হিফয করা, শব্দ ও অর্থ শিক্ষা করা এবং তদানুযায়ী আমলে যুক্ত থাকা।

হাদীস নং : ৩৬

عن ابن عمر رضـ قال: قال رسول الله ﷺ: لا حسد إلا على اثنين، رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار. (صحيح بخاري)

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হিংসাত্মক মনোভাব শুধু দুইজনের উপর পোষণ করা বৈধ রয়েছে :

এক. এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীম শিক্ষা দিয়েছেন আর সে দিনরাত তেলাওয়াতে মগ্ন থাকে।

দুই. এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদ দিয়েছেন, আর সে সব সময় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে।

ফায়দা : اتاه الله القرآن (কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন)-এর অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা মুখস্থ করিয়েছেন। 'মিরকাত' কিতাবে তাই উল্লেখ রয়েছে।

হাদীস নং : ৩৭

روى البخاري وغيره: من قرأ القرآن مات قبل أن يستظهر آتاه ملك يعلمه في قبره ويلقى الله وقد استظهره. (مرقات)

বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীম হিফয করা শুরু করে সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাকে কবরে এক ফেরেশতা এসে তা শিক্ষা দেবে এবং সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন হাফেযে কুরআন হয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।'[১]

সত্যায়ন : মাকামাতে মাজহারীতে মীর রুহুল আমীনের বরাত দিয়ে লেখা আছে, সুয়ূতী রহ. 'শরহুস্ সুদূর' কিতাবে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন : 'যে ব্যক্তি হিফয পূর্ণ করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে, ফেরেশতা তাকে একটি আপেল দেবে, শুধু এর ঘ্রাণেই তার সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ হয়ে যাবে।

হাদীস নং : ৩৮

في حديث الطبراني والبيهقي: من قرأ القرآن وهو ينفلت عنه ولا يدعه فله أجره مرتين، ومن كان حريصا عليه ولا يستطيعه ولا يدعه بعثه الله يوم القيامة مع أشراف أهله. (مرقات)

তাবারানী ও বায়হাকীর হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কুরআন হিফয করার পর চেষ্টা সত্ত্বেও ভুলে যায়, সে ব্যক্তি দ্বিগুণ সাওয়াবের

১. মিরকাত।

অধিকারী হবে। যে ব্যক্তি হিফয করতে আগ্রহী; কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারছে না, তবু চেষ্টা অব্যাহত রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কেয়ামতের দিন সম্মানি ও বিশেষ বান্দাদের সাথে উঠাবেন।'[১]

হাদীস নং : ৩৯

عن عائشة رضـ قالت: قال رسول الله ﷺ: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذى يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. (صحيح مسلم)

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, 'মাহেরে কুরআন' সম্মানি ও নেককার 'সাফারা'গণের সাথি হবে। আর যে ব্যক্তি বাধো বাধো স্বরে পড়ে এবং তেলাওয়াত করা তার জন্য কষ্টকর হয়, সে দ্বিগুণ প্রতিদানের অধিকারী হবে।[২]

ফায়দা : 'মাহের' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পটু ও পূর্ণ ধী-সম্পন্ন যদ্দরুন না সে পড়ায় আটকে, আর না-পড়া তার জন্য কষ্টকর হয়।[৩]

'সাফার' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আম্বিয়া আলাইহিস সালাম বা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ রা. অথবা ওই সমস্ত ফেরেশতা যারা লাওহে মাহফুজ বহনকারী বা ওই সমস্ত ফেরেশতা যারা ওহী বহন করার জন্য আদিষ্ট বা আমলনামা লেখকগণ অথবা ওই সমস্ত ফেরেশতা, যাদেরকে মানুষের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে।[৪]

'মাহেরে কুরআন আম্বিয়া কেরাম ও ফেরেশতাগণের সাথি হবে'- এর অর্থ হলো, সে যেমন দুনিয়াতে তাদের মতো আমল করেছে, তেমনি আখেরাতেও তাদের সঙ্গী হবে।[৫]

---

১. মিরকাত।
২. সহীহ মুসলিম।
৩. শরহে মুসলিম, ইমাম নববী রহ.।
৪. শুরুহে মেশকাত।
৫. আশিআতুল লুমআত।

উক্ত হাদীসের আলোকে আটকে আটকে তেলাওয়াতকারী দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী শুধু এ কারণেই হবে যে, তার অধিক কষ্ট ও মেহনত হয়। অন্যথায় মাহেরের দরজা তার থেকে অনেক বেশি।[১]

হাদীস নং : ৪০

يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله، فما نقذا مره فيتمثل له خصما فيقول: يا رب! قد حملته إياه فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: فشأنك به فيأخذ بيده، فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار، ويؤتى بالرجل الصالح قد كان حمله وحفظ أمره فيتمثل له خصما دونه، فيقول: يا رب! إياي فحفظ حدودي وعمل فرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال له: فشأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق، ويعقد عليه تاج الملك، ويسقيه كأس الخمر. (كنز)

কেয়ামত দিবসে কুরআনুল কারীমকে একজন পুরুষের রূপ দান করা হবে, অতঃপর তার কাছে এমন একজন ব্যক্তিকে নেওয়া হবে, যে তা হিফয করেছে অথচ তার হুকুম পালন করেনি। তখন কুরআনুল কারীম বিবাদী হয়ে বলবে, 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে আমার বাহক বানিয়েছিলেন; কিন্তু সে খারাপ বাহক ছিল, সে আমার সাথে সীমালঙ্ঘন করেছে, আমার ফরযকে ত্যাগ করেছে, আমার নাফরমানী করেছে এবং আমার আনুগত্য ত্যাগ করেছে।'

মোটকথা, এমনিভাবে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকবে। শেষপর্যন্ত হুকুম হবে যে, তুমিই তার ব্যাপারে মোক্তার। তখন কুরআনুল কারীম তার হাত ধরে অধোমুখ করে দোযখে নিক্ষেপ করবে।

---

১. আশিআতুল লুমআত।

পুনরায় তাঁর কাছে নেককার লোককে আনা হবে, যে কুরআন হিফয করেছে এবং তাঁর হুকুমের প্রতি লক্ষ রেখেছে। সুতরাং কুরআন তাঁর পক্ষ হয়ে বলবে, 'হে প্রভু! আপনি তাকে আমার বাহক বানিয়েছিলেন, সে আমার সাথে সীমালঙ্ঘন করেনি, আমার ফরযসমূহকে আদায় করেছে, আমার নাফরমানী করেনি এবং সর্বদাই আমার অনুগত রয়েছে।'

মোটকথা, এভাবে তার পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করতে থাকবে। শেষপর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হুকুম হবে, তুমিই তার ব্যাপারে মোক্তার। তখন সে তার হাত ধরে তাকে বেহেশতী পোশাক পরিধান করাবে, শাহী তাজ তার মাথায় রাখবে এবং শরবতের পেয়ালা পান করাবে।[১]

اللّٰهُمَّ اجعلني من الحفظة المكرمين، واحشرني معهم في يوم الدين. (آمين)

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সম্মানিত হাফেযগণের অন্তর্ভুক্ত করো এবং কেয়ামতের দিন তাদের সাথে হাশর করো।' আমীন।

১. কান্‌য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন মনীষীগণের বাণী ও ঘটনাবলি

১. ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর উক্তি : 'যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীম হিফয করল তার মাহাত্ম্য বেড়ে গেল।'[১]

২. শাইখ মুহিউদ্দীন আরাবী রহ. বলেন, 'ক্বারী (হাফেয) যেন বাগানের মালিক আর আলেম ওই ব্যক্তির মতো, যে বাগানের ফল-ফলাদি উৎপাদনে বৃক্ষ রোপণে পারদর্শী, এর লাভ ও উপকার সম্পর্কে অবগত। আর আমেল (কুরআনের হুকুম পালনকারী) বাগানের ফল ভক্ষণকারী সদৃশ। সুতরাং যে ব্যক্তি হিফয করল আলেম ও আমেল হল, সে বাগানের ওই মালিক সদৃশ, যে বাগানের বস্তু সম্পর্কে পরিচয় লাভ করল, উপযোগী ও অনুপযোগী বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হলো এবং ফল ভক্ষণ করল, উপযোগী ও অনুপযোগী বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হলো এবং ফল ভক্ষণ করল। আর যে ব্যক্তি হিফয করেনি শুধু আলেম ও আমেল হলো তার উপমা ওই লোকটি, যে বাগানের ফল-ফলাদি সম্পর্কে পরিচিত, চারা গাছ ও বীজ বপন করা জানে, কিন্তু ফল ভক্ষণ করে অন্যের বাগান থেকে। সুতরাং বাগানের মালিক তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ যাদের বাগান নেই, কারণ সবাই তার প্রতি মুহতাজ।[২]

৩. মাওলানা শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ওই হাদীসের প্রেক্ষিতে যাতে উল্লেখ আছে, 'আলেম ও মুতাআল্লিম (ছাত্র) যদি কোনো বস্তি অতিক্রম করেন, তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেখানকার গোরস্থান থেকে আযাব উঠিয়ে নেওয়া হয়' বলেন, হাফেয ও মুদাররিসীনকে গোরস্থানে অবস্থান করা পছন্দনীয়।[৩]

৪. হযরত আবু ইয়াকুব আযমাইয়াত রহ. তার কয়েকজন মুরিদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কুরআনুল কারীম স্মরণ আছে কী?

---

১. মিফতাহুল জান্নাত।

২. ফুতুহাতে মক্কিয়া।

৩. তাকমীলুল ঈমান।

তারা বলল, স্মরণ নেই। তখন তিনি বললেন,

واغوثاه باللہ مریدیکہ قرآن یادندارد چوں ترنجے است کہ بوئے ندارد پس بچہ چیز تنعّم می کند وبچہ چسز ترنم می کند وبچہ چیز با پروردگار خودراز گوید.

আল্লাহর পানাহ! যে মুরিদের কুরআন স্মরণ নেই, সে সুঘ্রাণহীন কমলা লেবুর মতো, সুতরাং কোন জিনিসের দ্বারা সে (খোদার প্রেমে বিভোর হয়ে) তার সঙ্গীত ও স্বর মাধুর্য প্রকাশ করবে, আর মহান প্রভুর দরবারে কী দিয়ে তার মনোভাব ব্যক্ত করবে?

৫. শাফেয়ী মাযহাবের কতক ফকীহ বিবাহে 'কুফুর' (কুল কৌলিণ্যে সমতা) বেলায় হিফযে কুরআনের লক্ষ করেছেন। যেমন, ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইমাম শিহাবুদ্দীন আহমাদ রমিলী রহ. 'নেহায়াতুল মুহতাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমার মরহুম পিতা ফতোয়া দিয়েছেন 'হাফেযে কুরআন যদিও অর্থ জ্ঞান না থাকে, তার মেয়ের 'কুফু' হাফেযে কুরআন ব্যতীত হবে না। উক্ত গ্রন্থের শব্দগুলো এরূপ :

أفتى الوالد رحمه الله بأن حافظ القرآن عن ظهر قلب مع عدم معرفته معناه لا يكافي ابنته من لا يحفظه.

শিব্বীর আমলুসি 'নেহায়াতুল মুহতাজ' গ্রন্থের হাশিয়া (প্রান্ত টীকায়) লেখেন যে, যেমনিভাবে হিফযে কুরআনের ব্যাপারটি পিতার ক্ষেত্রে ধর্তব্য, তেমনিভাবে অন্যান্য উসূলেও লক্ষণীয়। তিনি এর লেখেন, 'কুফুর' দিক দিয়ে পূর্ণ কুরআনে হাফেযের অর্ধ কুরআনের হাফেযের উপর অগ্রাধিকার রয়েছে।

৬. খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. একদা কর্মকর্তাদের প্রতি ফরমান জারি করলেন, আমাদের কাজে আহলে কুরআন (হাফেয) ব্যতীত অন্য কাউকে নিয়োগ করবে না।

কর্মকর্তাগণ উত্তরে লিখলেন, 'আমরা তাদেরকে নিয়োগ করেছি; কিন্তু তারা বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারেননি।' খলীফা পুনরায় লিখলেন না, আহলে কুরআন ব্যতীত অন্য কাউকে নিয়োগ করবে না। যদি তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী না থাকে, তবে অন্যদের মধ্যে এর আশাই করা যায় না।[১]

১. আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ।

৭. জাবীর সর্বদাই ফরযদককে পায়ে শিকল বাঁধার জন্য তিরস্কার ও বিদ্রুপ করত। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বর্ণনা করলেন, 'আমি একদা আমার পিতার সঙ্গে জঙ্গলের দিকে গেলাম; দূর থেকে একটি লোক দৃষ্টিগোচর হলো, যিনি গাছের নিচে ইবাদতে মশগুল। আমার পিতা তাকে দেখেই আপন ভাব-ভঙ্গি বদলে ফেললেন এবং নিতান্ত বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে চলতে লাগলেন। নিকটে পৌঁছে পায়ের জুতা খুলে ফেললেন এবং খুবই আদবের সাথে সালাম দিলেন; কিন্তু তিনি ভ্রুক্ষেপই করলেন না। দ্বিতীয়বার সালাম দিলে তিনি মাথা উঠিয়ে সালামের জবাব দিলেন।

পিতা বললেন, আমার ছেলে কবির কবিতা আবৃত্তি করে তিনি একবার মাত্র বললেন; তোমার ছেলেকে কুরআনুল কারীম হিফয করতে বলো। তারপর আমার পিতার সাথে সেখান থেকে এসে কাঁদতে লাগলাম। পিতা বললেন, বৎস, কাঁদছো কেন? আমি বললাম, এর কারণ হলো, আপনি বর্তমান কালের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, আলেম ও বুযুর্গ হওয়া সত্ত্বেও এমন একজন লোকের কাছে গেলেন, যিনি আপনাকে কোনো পরওয়াই করলেন না। পিতা বললেন, বেটা চুপ করো! তুমি জানো তিনি কে ছিলেন? তিনি হযরত আলী রা. ছিলেন। আমি বললাম, তিনি কি কুরআন হিফয করার তাগিদ করেছেন? বললেন, হ্যাঁ। এ কথায় আমার এত উৎসাহ হলো যে, তখনই হিফয শুরু করে দিলাম এবং এ অঙ্গীকারের উপর আমার পায়ে শিকল লাগিয়ে দিলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ কুরআনুল কারীম হিফয না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পায়ের শিকল খুলব না। শেষপর্যন্ত আপন অঙ্গীকার অটল ছিলাম। হিফয সমাপ্ত করে, তবে পায়ের শিকল খুললাম।

ফরযদক এক বৎসরে কুরআন হিফয করেছিলেন। তাঁর পঙ্ক্তিটি তাঁর উক্ত ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে :

وما صب رجلي في حديد مجاشع * مع القيد إلا حاجة لي أريدها

আমার পা আগ্রহচিত্তে শিকল পড়েছিল শুধু একটি অভাবের কারণে, যা আমি পূর্ণ করতে চাই।[১]

---

১. নেহায়াতুল ইজায ফী সীরাতে সাকিনিল হিজায।

৮. ইবনে বতুতা তার ভ্রমণকাহিনির পরিশেষে লিখেছেন, সুদানের পছন্দনীয় কাজ থেকে একটি হলো এই যে, তারা হিফযে কুরআনের বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকত। এ পর্যন্ত যে, তাদের সন্তানাদি যদি হিফযে কোনো প্রকার অলসতা করত, তবে তাদের পায়ে শিকল পরিয়ে দেওয়া হতো। হিফয সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে শিকল মুক্ত করা হতো না। এক সময় আমি ঈদের দিন কাজীর দরবারে গিয়ে দেখি তার বাচ্চার পায়ে শিকল। আমি তাকে বললাম, আপনি তাদেরকে মুক্ত করেন না কেন? তিনি বললেন, যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ কুরআন হিফয না হবে, ততদিন পর্যন্ত আমি তাদেরকে মুক্ত করতে পারি না।

একদা আমি একজন সুন্দর পোশাক পরিহিত যুবককে দেখলাম তার পায়ে ভারী শিকল বাঁধা। আমি আমার সাথিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যুবকটি কী অপরাধ করেছে? সে কি কাউকে হত্যা করেছে?' যুবকটি আমার কথা শুনে হেসে ফেলল। এরই মধ্যে আমাকে উত্তর দেওয়া হলো যে, 'না। সে কুরআন হিফয করার জন্য এরূপ করেছে।'

৯. সাইয়েদ মুহিবুল্লাহ বলগ্রামী রহ.-এর পূর্ণ যৌবনে হিফযে কুরআনের আগ্রহ জন্মালে তিনি বাসভবনের দ্বিতলে বসে ছয় মাসে কুরআন হিফয করেছেন। এ সময়ে তিনি কখনো নিচে নামেননি।[১]

১০. ইমাম যুফার রহ. শেষ জীবনে দুই বছরে কুরআনুল কারীম হিফয করেছেন। ইন্তেকালের পর স্বপ্নে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তাঁর অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বললেন, 'যদি দুটি বছর আমার না হতো, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।'

১১. সৈয়দ নুরুল্লাহ বলগ্রামী রহ. তরীকতের রাস্তা অতিক্রম করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলেন। তিনি হযরত সাইয়েদুল আরেফীনের কাছে আসলেন, যিনি একজন কামেল বুযুর্গ ছিলেন। হযরত অনেক তদবীর বাতলে দিলেন। কিন্তু কোনো জটিলতাই দূর হলো না। শেষপর্যন্ত বললেন, যাও কুরআন হিফয করে ফেলো। তিনি যখনই কয়েক পারা হিফয করে ফেললেন, তখনই সমস্ত জটিলতা দূর হয়ে গেল। তিনি হযরতের পায়ে পড়লেন এবং

---

১. মা'সিরুল কেরাম।

বাকি কুরআন হিফয করতে লাগলেন। পঁচিশ পারা হিফয হয়েছিল এরই মধ্যে অর্ধরাত পর্যন্ত নামায পড়ার কারণে তাঁর পা ফুলে গিয়েছিল। এ রোগেই তিনি নশ্বর দুনিয়া থেকে অবিনশ্বর জগতে চলে গিয়েছিলেন।

মৃত্যুর সময় লোকেরা তাকে প্রশ্ন করল, আপনার মনে কি কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষাই রয়ে গেল যে, বাকি পাঁচ পারা কুরআনুল কারীম হিফয করার সুযোগ মিলল না।[১]

১২. বর্ণিত আছে, কোনো এলাকায় একজন প্রসিদ্ধ ফাসেক ও ফাজের ছিল। তার মৃত্যুর পর অনেকেই তাঁকে স্বপ্নে দেখে যে, সে ব্যক্তি নেহায়েত কষ্টের মধ্যে আছে এবং সে বহু কান্নাকাটি ও ফরিয়াদ করছে। এরই মধ্যে এক বুযুর্গ হাফেযে কুরআনের মৃত্যু হয় এবং তাঁকে ওই ব্যক্তির পার্শ্বে দাফন করা হয়। তারপর যারা তাকে স্বপ্নে দেখল, তাকে খুব আরামের মধ্যে দেখতে পেল। স্বপ্নে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যে, তোমার কষ্ট কী করে লাঘব হলো? সে উত্তর দিল যে, আমার পার্শ্বে যে বুযুর্গ ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছে, তার বরকতে আল্লাহ তায়ালা আমার কষ্ট লাঘব করে দিয়েছেন এবং আমাকে এই শান্তি দান করেছেন।

والله أعلم بالصواب

১৩. নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মিসরের আদি অধিবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত হাফেযে কুরআন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত 'জামেয়া আজহার' বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। তাই মিশরে হিফযে কুরআন ও তাজবীদের ব্যাপক চর্চা হয়।

১৪. کتاب نزہۃ النظار এর মধ্যে নিম্নোক্ত কতগুলো পঙ্‌ক্তি লিপিবদ্ধ আছে,

بشراك بالإسعاف والإحسان * والبر والإنصاف والرضوان

ترانوید حصول مقاصد واحسان * ترانوید نکوئی وداد واستحسان

তোমার জন্য সুসংবাদ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার অনুগ্রহ, অনুগ্রহ দয়ার সৌন্দর্য, ন্যায়পরায়ণতা ও প্রসন্নতার।

---

১. মা'সিরুল কিরাম।

والجود من عند المليك تكرما * وتلطفا بك حامل القرآن

ترا نوید عطائے خدا ز ردیے کرم * کہ لطف اوست بروے تو حافظ قرآن

তোমার জন্য সুসংবাদ। সম্মানে ও দয়াচিত্তে রাজাধিরাজের পক্ষ থেকে দান ও অনুগ্রহের; যেহেতু তুমি একজন হাফেযে কুরআন।

تعطى الحبور بكل حرف عدما * قد جاء مسطورا بحسن بيان

دہد ثواب ترا حق بخواند ہر حرف * بداں شمار کہ مسطور شد بحسن بیان

প্রতি হরফ উচ্চারণে তিনি তোমাকে সাওয়াব দান করবেন। দুর্ভাগ্যবান মনে করো তাকে, যার কাছে তা এসেছে অতি সুস্পষ্ট আকারে লিখিতভাবে (অথচ সে তেলাওয়াত করেনি)।

مثلت بالأترج طعم طيب * كالعرف منشوق لذي إذعان

ترنج خوش مزہ کاں را جو طیب می بوبند * ترامثال بداں شد برائے ذی اذعان

তুমি এমন সুস্বাদু ও সুঘ্রাণযুক্ত কমলা লেবুর মতো, যার সুবাস বিশ্ববাসীর ইন্দ্রিয় শক্তি উপলব্ধি করতে পারে।

يأتي القرآن لدا الجزاء مجادلا * عن حامليه مخلصا للعاني

کلام پاک بوقت جزا بود حامی * برائے حافظ و مخلص برائے رنج کشان

কুরআনে কারীম কেয়ামত দিবস হাফেযে কুরআনকে সাহায্য করবে এবং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ দেবে।

يبدي السؤال لدى الشفاعة * في غد فيشفع الرحمن للسيأن

سوال وقت شفاعت کند بروز جزا * کند رحیم قبولش پے گنہگاراں

কেয়ামত দিবসে সুপারিশকালীন প্রার্থনা করবে; পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা গোনাহগারদের তার প্রার্থনা কবুল করবেন।

فاعمل به واتبع أوامره التي * فيه وجنب موقع الخسران

تو کاربند براں باش و حکم او بپذیر * نگاہ دار خودت راز موقع خسراں

সুতরাং তদানুযায়ী আমল করো এবং তার নির্দেশাবলি মেনে চলো। এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো।

واخلص قراءته تنل ما ترتجي * فضلا ومنا من عظيم الشأن

تلاوتش و سر صدق کن بکام رسی * بفضل وجود خدائے کریم عالی شاں

খালেস ও নির্ভেজাল নিয়তে তার তেলাওয়াত করো; অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে; মহীয়ান-গরীয়ান রাজাধিরাজের পরম দয়া ও বিশেষ অনুগ্রহে।

দ্বিতীয় অধ্যায় :
হিফযে কুরআনের আদব সম্পর্কিত

সূচনা : প্রথম অধ্যায়ে হাফেযে কুরআনের ফাযাইলের উপর সুন্দরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে যেহেতু শুধু হাফেযে কুরআন হওয়ার দ্বারাই এ সমস্ত ফাযাইলের অধিকারী হওয়া যায় না, যতক্ষণ না কুরআন-হাদীস মোতাবেক আমল করা হয়। বস্তুত হিফযে কুরআনের অর্থই হচ্ছে কুরআনের বিধান মোতাবেক আমল করা। ইতক্বান নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা রা.-এর নিকটে এসে বলল, 'আমার ছেলে হাফেযে কুরআন।' তিনি একথা শুনে প্রথমে দুআ দিলেন, অতঃপর বললেন, মূলত কুরআন হিফয সেই করেছে, যে তার নির্দেশনাবলির অনুসরণ করে।

সেহেতু কয়েকটি পরিচ্ছেদে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। যেগুলোর উপর আমল করা হাফেযে কুরআনের জন্য অত্যাবশ্যক এবং যেগুলো ওই সমস্ত ফাযাইলের অধিকারী হওয়ার একমাত্র মাধ্যম।

প্রথম পরিচ্ছেদ :
হাফেযে কুরআনের কর্তব্য

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে তাশরীফ নিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'হে হাফেযে কুরআন! তুমি বিলাপ করো, যখন নির্বোধেরা হাসে। রাত্রী জাগরণ করো, যখন মানুষ ঘুমে থাকে। রোযা রাখো, যখন লোকেরা ভক্ষণ করে। তোমার অত্যাচারীকে ক্ষমা করো, ঈর্ষাপরায়ণ লোকদের ন্যায় ঈর্ষা কোরো না। মূর্খ লোকদের মতো মূর্খতা কোরো না।[১]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, 'কুরআন আল্লাহর কালাম এজন্য হাফেযে কুরআনের উচিত আপন প্রভুর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা।[২]

---

১. কানযুল উম্মাল।

২. কানযুল উম্মাল।

ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, 'হাফেযে কুরআনের উচিত এ সমস্ত বিষয়সমূহ লক্ষ রাখা :

১. রাতকে, যখন মানুষ ঘুমন্ত থাকে।

২. দিবসকে, যখন মানুষ গোনাহ করে।

৩. চিন্তা-ফিকিরকে, যখন আনন্দিত থাকে।

৪. ক্রন্দন করাকে, যখন মানুষ হাসে।

৫. নীরবতাকে, যখন মানুষ অনর্থক কথাবার্তায় নিমগ্ন থাকে।

৬. বিনম্রতাকে, যখন মানুষ গর্ব ও অহংকার করে।

হাফেযে কুরআনের উচিত নম্র-ভদ্র ও বিনয়ী হওয়া। অত্যাচারী, ঝগড়াটে অহেতুক ও পাষাণ মেজাযসম্পন্ন হওয়া তার জন্য অশোভনীয়।'[১]

ফুযাইল ইবনে আয়ায রহ. বলেন, 'হাফেযে কুরআন যে ছোট-বড় কারো মুখাপেক্ষী না হয়; বরং তার প্রতি অন্যান্য লোক যেন মুখাপেক্ষী হয়। হাফেযে কুরআন ইসলামের ঝান্ডাবাহী। অন্তত কুরআনের প্রতি লক্ষ করে তার উচিত খেলাধুলা, ভুলত্রুটি ও অলসতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা।'

আবু সুলাইমান দারানী রহ. বলেন, 'যদি কোনো হাফেযে কুরআন কালামে পাক তেলাওয়াত করার পর আল্লাহর অবাধ্য হয়, তাহলে জাহান্নামের ফেরেশতাগণ প্রতিমা পূজারীদের তুলনায় তাকে দ্রুত গ্রেফতার করবেন।'[২]

মাইসারাহ বলেন, 'পাপী ব্যক্তির অন্তরে কুরআনুল কারীম এক অচেনা, অজানা ও অপরিচিত বস্তু।'[৩]

হযরত আলী রা. বলেন, 'হে কুরআনের বাহক! কুরআন অনুযায়ী আমল করো। কেননা, জ্ঞানী সেই, যে আপন জ্ঞান অনুসারে আমল করে এবং তার যাবতীয় কাজকর্ম আপন জ্ঞানের চৌহদ্দির ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখে।'

ক্বারী সাহেবের যাবতীয় কাজকর্ম এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্যের থেকে তুলনামূলকভাবে আলাদা হওয়া চাই। উগ্র, মূর্খ, লোকদের মতো

---

১. ইহয়াউল উলূম।

২. কানযুল উম্মাল।

৩. ইহয়াউল উলূম।

উগ্রতা, মূর্খতা করা উচিত নয়। কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের চরিত্র হুবহু কুরআনের রূপরেখা ছিল। হাসি-আনন্দ, সুখ-দুঃখ সবই কুরআনের আহকাম মোতাবেক ছিল।

সাহাবায়ে কেরামের নিকট ক্বারী তাকেই বলা হতো, যার দেহ জীর্ণশীর্ণ গঠনের ও হরিদ্রাবর্ণের। সাধারণত ক্রন্দনই তিনি বেশি করেন। চক্ষু দিয়ে অশ্রু বের হয়ে আসে, যখন লোকেরা হাসে। মানুষের আনন্দঘন মুহূর্তেও তাঁর হৃদয়ে থাকে ব্যথিত। অন্যের গর্ব-অহংকারেও তাঁর বিনয়ী ভাব ফুটে ওঠে। মানুষ যখন রোযা রাখে না, তখনো তিনি রোযা রাখেন।[১]

আদভী থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর রা. একসময় সেনানায়কদের নিকট চিঠি দিলেন, 'সেনাবাহিনীর মধ্যে যদি হাফেযে কুরআন থাকে, তবে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। যাতে সরকারি কোষাগার থেকে বেতন নির্ধারণ করে তালীমের জন্য বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করা যায়।'

উক্ত পত্রের জবাবে আশআরী রা. লিখলেন, 'তিন শতাধিক হাফেযে কুরআন আমাদের সেনানিবাসে রয়েছেন।' অতঃপর ওমর রা. পত্র দিলেন। 'ওমরের পক্ষ হতে প্রেরিত। আবদুল্লাহ ইবনে ক্বাইস ও তার সহপাঠী হাফেয সাহেবানদের প্রতি রইল সালাম। তৎপর জেনে রাখো যে, কুরআনুল কারীম তোমাদের ইজ্জত সম্মান ও মুক্তির হেতু এবং পরকালের সঞ্চয়। তোমরা কুরআনুল কারীমের অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীমের অবাধ্য হবে, তাকে গ্রেফতার করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর যে কুরআনুল কারীমকে মানবে, তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দেওয়া হবে।

তোমরা তার অনুসরণ করে তাকে নিজের সুপারিশকারী বানাও, অভিযোগ-কারী বানিও না। কারণ কুরআনুল কারীম যার সুপারিশকারী হবে, সে জান্নাত পাবে; আর যার অভিযোগকারী হবে, সে জাহান্নামী হবে। স্মরণ রেখো! কুরআনুল কারীম হেদায়াতের উৎস ও ইলমের নূর।

অন্যান্য আসমানী কিতাবের তুলনায় কুরআনুল কারীমের নামটি নতুন। তাঁর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও পর্দাবৃত অন্তর থেকে পর্দা তুলে নেন। মনে রেখো! যখন বান্দা রাতে ওঠে, মিসওয়াক ও ওযূ করে "আল্লাহু

১. তারীখুল খুলাফা।

আকবার” বলে ক্বেরাত আরম্ভ করে, আল্লাহ্ তায়ালা নিজের মুখ তার মুখের উপর রেখে বলেন, “তেলাওয়াত করো, তেলাওয়াত করার মতো। তুমি পবিত্র, তোমার পরিণাম শুভ।” আর যদি শুধু ওযূ করে মিসওয়াক না করে, তার প্রতিও আল্লাহ্পাক কৃপার দৃষ্টি দেন, তাকে ভুলে যান না। মনে রেখো! নামাযে কুরআন তেলাওয়াত এক মহামূল্যবান গুপ্তভাণ্ডার। এজন্য সামর্থ্য অনুযায়ী বেশি বেশি তেলাওয়াত করো।

নামায হলো নূর। যাকাত হলো দলিল। ধৈর্য হলো আলো। রোযা হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঢাল। কুরআনুল কারীম হয়তো তোমাদের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ হবে। সুতরাং কুরআনের তাযীম করো, তার বেইজ্জতী কোরো না। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা তার সম্মানকারীকে সম্মানিত, অপমানকারীকে অপমানিত করবেন।

জেনে রাখো! যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীম হিফয করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, তার একটি দুআ আল্লাহর দরবারে মকবুল হবে।

ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেই এর প্রতিদান নিতে পারবে অথবা পরকালের অবলম্বন হিসেবেও রেখে দিতে পারবে।[১]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :
হাফেযে কুরআনের দুটি কথা স্মরণযোগ্য

হাফেযে কুরআনের উচিত নিম্নের জরুরি দুটি কথা জেনে নেওয়া। প্রথম কথা হচ্ছে, ইলমুল ক্বিরাত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। কারণ সহীহ-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত ব্যতীত সাওয়াবের আশা করা যায় না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কুরআনুল কারীমের শব্দ যেমন মুখস্থ, তেমনই তার অর্থ, বিষয়বস্তুও আয়ত্তে আনা প্রয়োজন। কারণ কুরআনে পাক অবতীর্ণ করার একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে, বান্দা তার বিষয়বস্তুর উপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করবে এবং নিজের চরিত্র ও অভ্যাস তদনুযায়ী গড়ে তুলবে, তার আদেশ নিষেধ মেনে চলবে। এগুলো তখনই সম্ভব হবে, যখন তার অর্থ ও বিষয়বস্তুর উপর প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হবে। আল্লাহর ফযলে এটা ওই

---

১. কানযুল উম্মাল।

যামানায় খুব কঠিন ব্যাপার ছিল না। ওলামায়ে কেরাম প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় কুরআনুল কারীমের শত-সহস্র তাফসীরগ্রন্থ রচনা করেছেন। এখনো রচনায় নিমগ্ন ও লিপ্ত আছেন। এ পর্যন্ত বহু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যদ্বারা কুরআনুল কারীমের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু আয়ত্তে আনা অত্যন্ত সহজসাধ্য। শব্দার্থ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জেনে তেলাওয়াত করাই হচ্ছে সর্বোত্তম তেলাওয়াত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :
তেলাওয়াতে অলসতার পরিণাম

হাফেযে কুরআনের অলস ও চৈতন্যহীন অবস্থায় তেলাওয়াত করা উচিত নয়, যাতে ভুলে যাওয়ার উপক্রম না হয়।

নাসায়ী শরীফে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হাফেযে কুরআন বন্দি করা উটের মালিকের মতো। যদি সে তাকে হেফাযত করে, তবে তার আয়ত্তাধীন থাকবে। আর যদি ছেড়ে দেয়, তাহলে পলায়ন করবে।'

মিশকাত শরীফে হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কুরআনুল কারীম হেফাযত করো, কারণ শপথ ওই সত্তার, যার হাতে আমার আত্মা! কুরআনুল কারীম আটক রাখা উটের চেয়েও বেশি পলায়নকর।'

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার উম্মতের সমস্ত নেক কাজগুলো আমাকে দেখানো হলো, এমনকি ওই ব্যক্তিরও যে মসজিদ হতে ধূলিমলিন অবস্থায় বের হয়। এবং পাপ কাজগুলোও দেখানো হলো, তন্মধ্যে সবচাইতে বড় পাপী ওই ব্যক্তিকে পেলাম, যে ব্যক্তি কোনো আয়াত বা সূরা মুখস্থ করে ভুলে যায়।'[১]

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীম পড়ে ভুলে যায়, সে আল্লাহর সাথে কুষ্ঠরোগী হয়ে সাক্ষাৎ করবে। অর্থাৎ তার হাত কর্তিত থাকবে বা লজ্জায় মস্তক অবনত হবে, অথবা কুষ্ঠরোগীর আকৃতি হবে।'[২]

---

১. আবু দাউদ, তিরমিযী।

২. আবু দাউদ, দারেমী।

তবে এটাও জানা প্রয়োজন যে, ভুলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে (আমাদের নিকট) দেখেও না পড়তে পারা। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. নিকট এর অর্থ হচ্ছে মুখস্থ পড়তে না পারা।[১]

উল্লেখ্য, 'শিরাআতুল ইসলাম' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, কালামে পাক ভুলে যাওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া। তাই হাফেযে কুরআনের সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে, যাতে এমন কোনো গোনাহ না হয়, যার দ্বারা এ মহামূল্যবান নেয়ামত হৃদয় থেকে মুছে যায়।'

পাপের কারণে কুরআনুল কারীম ভুলে যাওয়ার ঘটনাসমূহ

আবু আমর রহ. কালামে পাক শিক্ষা দিতেন। একদিন সুন্দর আকৃতিসম্পন্ন এক বালক তার নিকটে এসে বলল, 'আমাকে আপনি কুরআন শিক্ষা দিন।' আবু আমর রহ.-এর কুদৃষ্টি তার উপর পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি শুরু থেকে শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ কালামে পাক ভুলে গেলেন। অস্থির হয়ে তিনি হযরত হাসান বসরী রহ.-এর নিকট গেলেন। অতঃপর হাসান বসরী রহ. বললেন, 'কালবিলম্ব না করে তুমি হজে রওনা হও। হজ সম্পন্ন করে মসজিদে খাইফে চলে যাও। সেখানে এক বয়োবৃদ্ধ মেহরাবে বসে আছেন। তাঁর সময় নষ্ট কোরো না। তিনি যদি ওযীফা আদায়ে ব্যস্ত থাকেন, তবে অবসর হওয়ার পর দুআর দরখাস্ত কোরো।' আবু আমর হযরত হাসান বসরী রহ.-এর কথানুযায়ী তাই করলেন। মসজিদে খাইফের এক কোণে বসে তিনি দেখলেন মাঝখানে এক বৃদ্ধ, পাশে অন্যান্য লোক বসা। কিছুক্ষণ পর পাক পবিত্র সাদা বস্ত্র পরিহিত এক লোক ওই বৈঠকে উপস্থিত হলেন। মানুষ তাকে সালাম করে পরস্পর কথোপকথনে লেগে গেল। নামাযের সময় হওয়া মাত্রই ওই লোক চলে গেলেন। অন্যান্য লোকেরাও তার অনুগমন করল। ওই বৃদ্ধ লোকটি তার আসনে এখন একাকী। আবু আমর বলেন, 'তখন আমি তার নিকটে গিয়ে সালাম দিয়ে আমার আরজি পেশ করলাম—অনুগ্রহপূর্বক আমার নিবেদনটুকু শ্রবণ করুন। অতঃপর তার অবস্থা খুলে বললেন। বিস্তারিত শুনে বৃদ্ধ লোকটি চিন্তিত হলেন এবং চক্ষু

১. মিশকাত শরহে মিশকাত।

দুটি দিয়ে আকাশের দিকে এমনভাবে তাকালেন যে, দৃষ্টি স্বাভাবিক হওয়ার আগেই সমস্ত কালামে পাক আমার জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল।'

আবু আমর বলেন, আনন্দের আতিশয্যে আমি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম। এ মহান সাধক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তোমাকে আমার পরিচয় দিয়েছে?' আমি বললাম, 'হাসান বসরী রহ.।'

আবু আব্দুল্লাহ জালা রহ. বলেন, 'একদিন আমি এক যুবককে দেখলাম। যার অলৌকিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। ঘটনাক্রমে সেদিন হযরত জুনাইদ রহ.-এর আগমন ঘটল। আমি তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, এমন লোকও কি জাহান্নামের আগুনে পুড়ে ভস্ম হবে? তিনি বললেন, এ ধরনের লোক হলো শয়তানের ফাঁদ। এটাই তোমাকে প্রলুব্ধ করছে। স্মরণ রেখো! এটা খারাপ দৃশ্য, শিক্ষণীয় দৃশ্য নয়। যদি তা শিক্ষণীয় দৃশ্য হতো, তবে আঠারো হাজার আলমে অনেক শিক্ষণীয় দৃশ্য মজুদ আছে, সেখান থেকে তুমি শিক্ষা গ্রহণ করো। শয়তানের ফাঁদ ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। অচিরেই তোমাকে এ দৃষ্টির শাস্তিতে গ্রেফতার হতে হবে।

আবু আবদুল্লাহ বলেন, হযরত জুনাইদ রহ. একথা বলার সাথে সাথেই আমি কালামে পাক ভুলে গেলাম। এরপর কয়েক বছর পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করলাম এবং চোখের অশ্রু বিসর্জন দিয়ে তওবা করলাম। তখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে কালামে পাক হিফয করিয়ে দিলেন। সুদীর্ঘ দিন অতীত হয়ে গেল; কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো বস্তু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। কারণ, কোনো বস্তুর প্রতি লক্ষ করা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইবনে সিক্বা যিনি হাফেয ছিলেন, অতঃপর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যান এবং ওই বিশ্বাসের উপরই তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুশয্যায় লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, এখনো কি তোমার কুরআনুল কারীম স্মরণ আছে? তখন সে বলল, নিম্নোক্ত আয়াত ব্যতীত আমার কোনো কিছুই স্মরণ নেই।

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

'কখনো কখনো কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে, যদি তারা মুসলমান হতো।' (সূরা হিজর, আয়াত : ২)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :
কুরআনুল কারীম কত দিনে খতম করতে হয়

অনেক ওলামায়ে কেরাম বলেন, প্রত্যেক হাফেযে কুরআনের উচিত প্রতি চল্লিশ দিনে একবার কুরআনুল কারীম খতম করা। যেমন, ফতোয়ায়ে ক্বাযীখানে লেখা রয়েছে :

قالوا: وينبغي لحامل القرآن أن يختم القرآن في كل أربعين يوما مرة.

'আলেমগণ বলেন, প্রত্যেক হাফেযে কুরআনের উচিত প্রতি চল্লিশ দিনে একবার কুরআনুল কারীম খতম করা।'

আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-কে বললেন, 'তুমি প্রতি চল্লিশ দিনে একবার কুরআনুল কারীম খতম কর। তবে তার চেয়ে আরও অল্প সময়ে খতম করা বেশি উত্তম।' যেমন, মাজমাউল বিহার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে :

اقرؤوا القرآن في كل شهر إشارة إلى تدبر فيه، والمختار تكثيره إلى حيث يمكنه تدبره.

'কুরআনুল কারীম প্রত্যেক মাসে খতম করো।' উক্ত হাদীস এ বিষয়েরই ইঙ্গিত বহন করে যে, কালামে পাকের অর্থ গভীরভাবে অনুধাবন করে তেলাওয়াত করা আবশ্যক। তবে যতটুকু সময়ের মধ্যে কুরআনুল কারীমের অর্থ অনুধাবন করে খতম করা সম্ভব, সেই সময়ের ভেতরেই খতম করা অতি উত্তম।

অন্যান্য হাদীসে তিন দিনের কম সময়ে কুরআনুল কারীম খতম করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যেমন, মিশকাত শরীফে আবদুল্লাহ

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, 'যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআনুল কারীম খতম করল, সে কুরআনুল কারীমের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেনি।'

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. মিরকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পূর্বসূরিদের এক জামাত সর্বদা উক্ত হাদীস মোতাবেক কুরআনুল কারীম তিন দিনে খতম করতেন এবং তার চেয়ে কম সময়ের খতম করাকে মাকরূহ মনে করতেন। কিন্তু অন্যান্যদের মতে তিন দিনের কম সময়ে খতম করা মাকরূহ নয়। কেননা, উক্ত হাদীসে বর্ণিত তিন দিনে কুরআনুল কারীম খতম করো'—এর অর্থ এই নয় যে, তিন দিনের কম সময়ে খতম করা যাবে না; বরং এর অর্থ হলো তিন দিনে খতম করাই শ্রেয়। এজন্য অনেকে রাতদিনে এক খতম করে। কেউ কেউ দুই খতম বা তিন খতমও করে থাকেন। আবার শুধু এক রাকাতে অনেকেই কুরআনুল কারীম খতম দিয়ে থাকেন। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ কয়েকজন মহামনীষীর নাম উল্লেখ করা হলো, যারা স্বল্প সময়ে কুরআনুল কারীম খতম করতেন।

যেসকল মনীষী অতি অল্প সময়ে কুরআনুল কারীম খতম করতেন

হযরত ওসমান রা. এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম খতম করেছিলেন।

সাঈদ ইবনে যুবাইর রা. কাবা শরীফের ভেতরে এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম খতম করেছিলেন।[১]

তামীম দারী রা.-ও এক রাকাতে খতম করেছিলেন।

ইমাম আবু হানীফা রহ. একাধারে ত্রিশ বছর পর্যন্ত রাতে জাগ্রত থেকে এক রাকাতে খতম করতেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. প্রতি মাসে ত্রিশ খতম দিতেন। আর মাহে রমযানে চব্বিশ ঘণ্টায় ষাট খতম দিতেন।[২]

---

১. তিরমিযী।

২. মানাকিবুশ শাফেয়ী।

হযরত গাওসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী রহ. লাগাতার পনেরো বছর ইশার পর থেকে ভোর পর্যন্ত এক কদমে দাঁড়িয়ে খতম করতেন।[১]

মাহমুদ ইবনে ইউসুফ ইবনে মা'দান রহ. জীবিকা নির্বাহের উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন এক খতম তেলাওয়াত জারী রাখতেন।[২]

খাজা হুযাইফা মারআ'শী রহ. প্রত্যেক রাতে এক খতম দিতেন।[৩]

শাইখ আবুল হাসান হাংকারী রহ. বাদ ইশা থেকে তাহাজ্জুদ পর্যন্ত দুই খতম করতেন।[৪]

খাজা আবু আহমদ চিশতী রহ. দিনের বেলা এক খতম আর রাতের বেলা দুই খতম করতেন।[৫]

সুলাইমান রা. এক রাতে তিন খতম করতেন।[৬]

মোহাম্মাদ ইবনে ফাযাহ রহ. প্রতিদিন তিন খতম করতেন।[৭]

খাজা ইউসুফ রহ. চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচ খতম করতেন।[৮]

সুফী ইবনে কাতের রহ. দিনে চার খতম আর রাতেও চার খতম করতেন।

শাইখ মুসা মাদরানী রহ. প্রতিনি সত্তরবার খতম করতেন।

উল্লিখিত মহামনীষীগণ ছাড়া আরও অনেক বুযুর্গানে দ্বীন অতি অল্প সময়ে কালামে পাক খতম করার বর্ণনাও বিদ্যমান রয়েছে। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার দরুণ সেসব উল্লেখ করা হলো না। যদি কোনো আগ্রহী পাঠক থেকে থাকেন, তাহলে ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ তালাশ করে দেখে নিন।

'মালাবুদ্দা মিনহু' গ্রন্থে লিখিত আছে, যে পরিমাণ তেলাওয়াতে স্থিতিশীলতা

---

১. মাহফিলে গিয়ারহুয়া।
২. নফতাহুল উনস।
৩. আনওয়ারুল আরেফীন।
৪. আনওয়ারুল আরেফীন।
৫. আনওয়ারুল আরেফীন।
৬. আইনী শরহে বোখারী।
৭. নফহাতুল উনস।
৮. আনওয়ারুল আরেফীন।

বজায় রাখা সম্ভব, সে পরিমাণ প্রতিদিন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। যেমন প্রতি মাসে এক, দুই বা তিন খতম তেলাওয়াত করা বা সাত রাতে এক খতম তেলাওয়াত করা অধিকাংশ সাহাবার আমল ছিল।

'সিরাজুল ক্বারী' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, হযরত ওসমান ইবনে আফফান রা. শুক্রবার রাতে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত আরম্ভ করতেন এবং বৃহস্পতিবার রাতে শেষ করতেন। এজন্যই কুরআনুল কারীমকে সাত মনযিলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম মনযিল সূরায়ে ফাতেহা থেকে সূরায়ে নিসা পর্যন্ত। দ্বিতীয় মনযিল সূরায়ে মায়েদা থেকে সূরায়ে তওবা পর্যন্ত। তৃতীয় মনযিল সূরায়ে ইউনুস থেকে সূরায়ে নাহল পর্যন্ত। চতুর্থ মনযিল সূরায়ে বনী ইসরাঈল থেকে সূরায়ে ফুরকান পর্যন্ত। পঞ্চম মনযিল সূরায়ে শুয়ারা থেকে সূরায়ে ইয়াসিন পর্যন্ত। ষষ্ঠ মনযিল সূরায়ে ওয়াস সাফফাত থেকে সূরায়ে হুজরাত পর্যন্ত। সপ্তম মনযিল সূরায়ে ক্বাফ থেকে সূরায়ে না'ম পর্যন্ত।

মোটকথা, চল্লিশ দিন বা তার চেয়ে কম সময়ে এক খতম করা উচিত। এমন কখনো যেন না হয় যে, সারা বছর তেলাওয়াত বন্ধ করে রাখবে আর শুধু মাহে রমযানে আরম্ভ করবে।

'আল বয়ানুল জারীল' নামক কিতাবের ভাষ্য এই যে, একালের অধিকাংশ হাফেয সাহেবান এ রোগেরই রোগী। গর্ব ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে তারা বলেন যে, সারা বছর তেলাওয়াত না করে শুধু রমযানেই আমরা শোনাতে পারি। তাদের উদ্দেশ্য হলো, প্রখর মেধা ও স্মরণশক্তি দেখিয়ে মানুষের প্রশংসা লাভ করা। এটা তাদের বোধগম্য হয় না যে, কালামে পাক হিফয করার একমাত্র ফায়দা হচ্ছে অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করতে পারা। লোক দেখিয়ে এবং মানুষের প্রশংসা লাভে ধন্য হয়ে নরকীয় কীট হওয়া নয়।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত কিতাবের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদের নামাযে কুরআনে পাক তেলাওয়াত করা হাফেযে কুরআনের উপর জরুরি। সাহাবা, তাবেঈন ও আমাদের পূর্বসূরি মহামনীষীগণ সাধারণত তাহাজ্জুদের নামাযেই কালামে পাক তেলাওয়াত করতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল

নিম্নে এমন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল বর্ণনা করা হলো, যেগুলোর উপর প্রত্যেক হাফেযে কুরআনের সার্বক্ষণিক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

মাসআলা-১ : ওযূবিহীন কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করা জায়েয আছে, তবে ওযূর সাথে তেলাওয়াত করা উত্তম। যেমন, অধিকাংশ ফিকাহশাস্ত্রের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

মাসআলা-২ : বায়ু বের হওয়ার মুহূর্তে মৌখিকভাবেও তেলাওয়াত করা ঠিক নয়; বরং সে পরিমাণ সময় অপেক্ষা করা উচিত।[১]

মাসআলা-৩ : আরোহণ ও পায়ে হেঁটে তেলাওয়াত দোষণীয় নয়, তবে নাপাক স্থানে তেলাওয়াত করা মাকরূহ।[২]

মাসআলা-৪ : শোয়া অবস্থায় তেলাওয়াত জায়েয আছে, তবে পদদ্বয় সংবরণ করে রাখা উচিত।[৩]

মাসআলা-৫ : মহিলাগণ সুতা কাটার সময় এবং পুরুষগণ কাপড় তৈরির সময় তেলাওয়াত করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো একনিষ্ঠ হৃদয়ের। এমনিভাবে ব্যবসায়ীগণ আপন ব্যবসায় ব্যস্ত থাকাকালীনও জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো তেলাওয়াতে প্রতিবন্ধক না হওয়া।[৪]

মাসআলা-৬ : কবরের পাশে কালামে পাক তেলাওয়াত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে মাকরূহ; কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে মাকরূহ নয়। ফতোয়া এ মতের উপরই।[৫] ক্বেরাত ও আদব সম্পর্কেত বাকি মাসায়েল অন্যান্য কিতাবে দেখে নিতে হবে

---

১. ইত্তেহাফুস সাদাহ্।
২. ক্বানিয়্যাহ।
৩. খাযানাতুর রিওয়ায়াহ।
৪. খাযানাতুর রিওয়ায়াহ।
৫. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :
তেলাওয়াতে ইখলাসের গুরুত্ব

অন্যান্য ইবাদতে সাওয়াব লাভের জন্য যেমন ইখলাস (একনিষ্ঠতা) শর্ত, তেমনই কালামে পাক তেলাওয়াত ও হিফয করার ক্ষেত্রেও ইখলাস শর্ত। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষত হাফেয সাহেবানদের উচিত কালামে পাক তেলাওয়াত করার সময় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্যবস্তু স্থির করা।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে 'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে তেলাওয়াত করবে, তার সাথি হবে সিদ্দীকিন, শুহাদা এবং নেককার বান্দাগণ। কতইনা উত্তম সেসকল সাথিবৃন্দ![১]

মোটকথা, এ কাজে নিজের প্রচার-প্রসার বা দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্য সাধন যেন মুখ্য না হয়।

সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, 'কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা একজন ক্বারী সাহেবকে ডেকে বলবেন, আমার প্রদত্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমার জন্য কী করেছ? সে উত্তরে বলবে, নিজে শিখেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি। আল্লাহ পাক বলবেন, তুমি আমার জন্য শেখোনি এবং শিক্ষা দাওনি; বরং লোকেরা যেন তোমাকে ক্বারী বলে সম্বোধন করে; সে জন্য শিখেছ। লোকদের সম্বোধন তো তুমি পেয়েই গেছ। এখন আর কী? অতঃপর তাকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।[২]

মিশকাত শরীফে হযরত বুরাইদাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, 'যে ব্যক্তি কালামে পাক তেলাওয়াত করে মানুষের কাছ থেকে আহার্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে তার চেহারায় কেয়ামতের দিবসে গোশতবিহীন হাড় পরিলক্ষিত হবে। অর্থাৎ সে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে।

১. তাফসীরে ইতক্বান।
২. আল বয়ানুল জাযীল।

মোল্লা আলী কারী রহ. লেখেন, এ ব্যক্তি যেহেতু মহামূল্যবান বস্তু (কালামে পাক) ও সম্মানি অঙ্গ (অন্তর)-কে হীন ও নগণ্য বস্তু অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছে, এজন্য কেয়ামত দিবসে বিবর্ণ ও কুশ্রী চেহারা বিশিষ্ট হবে।[১]

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, কুরআনুল কারীম শিক্ষা করো এবং জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম বানাও, দুনিয়ার উপকরণ বানানোর পূর্বেই। কারণ, কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করবে তিন ধরনের লোক; এক. গর্ব, অহংকার ও প্রতিপত্তি অর্জনার্থে। দুই. জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে। তিন. আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশায়।[২]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি কোনো আমীরের দরবারে গিয়ে তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি হরফের পরিবর্তে তার উপর একটি লানত (অভিশাপ) আর আমীরের উপর দশটি লানত বর্ষণ করবেন।

কুরআনুল কারীম কেয়ামত দিবসে তার সাথে বাক-বিতণ্ডা করবে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আপন মৃত্যুকে তালাশ করবে। তাকে বলা হবে, একটি মৃত্যুকেই শুধু তালাশ কোরো না; বরং একাধিক মৃত্যুর আশা পোষণ করো।[৩]

এ ভীতি প্রদর্শন তখনই হবে, যখন তেলাওয়াতের দ্বারা দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্য সাধন করা মুখ্য হয় এবং এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ ও সাওয়াব লাভ করা মাকসাদ না হয়। কুরআনুল কারীম দ্বারা বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কিত বিষয়টি বিতর্কিত, তাই এখানে এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। জানতে হলে দেখুন, ফাতহুল ক্বাদীর, আইনি শরহে হেদায়া, শামী, ফতোওয়ায়ে তানক্বিহে হামিদিয়া, জওহারায়ে নিরাহ, সিরাজুল ওয়াহহাজ, তাফসীরে গারিজী, রিসালায়ে মুফতী হামজাহ, রিসালায়ে আল্লামা শামী ইত্যাদি।

যাহোক, সব ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উত্তম কাজ। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমান বিশেষত হাফেযে কুরআনের উচিত সাধ্যানুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন করা। দুনিয়ার মধ্যে সময়ের অতিক্রম বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। তন্মধ্যে আপন পদমর্যাদা ও মাহাত্ম্যের উপযোগী দিকটা নির্বাচন করা উচিত।

---

১. কানযুল উম্মাল।

২. কানযুল উম্মাল।

৩. কানযুল উম্মাল।

বুযুর্গানে দ্বীন ওলামা হযরত ও মহামনীষীগণ সর্বক্ষণ সাবধানতার পথ অবলম্বন করে চলতেন এবং কালামে পাককে মর্যাদা দানে সর্বদা সতর্ক থাকতেন।

কুরআনুল কারীম দ্বারা বিনিময় গ্রহণ না-করার অনুকরণীয় ঘটনাসমূহ

আবু শামাহ রহ. শরহে শাতেবী কিতাবে লেখেন, আবু আমারাই হামযাহ ইবনে যাইয়্যাত-এর খোদাভীতি ও ভক্তি এবং কুরআনুল কারীম দ্বারা বিনিময় গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো ক্বারী সাহেবের মধ্যে পাওয়া যায় না। জারীর ইবনে আবদুল হামীদ বর্ণনা করেন, একদা হামযাহ ইবনে যাইয়্যাত প্রচণ্ড গরমে আমার নিকটে আসলেন। পানি পান করার জন্য আমি তাকে বললাম, তিনি তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করলেন এবং পান করলেন না। কারণ, ছিল এই যে, তিনি তার নিকটে কালামে পাক তেলাওয়াত করেছিলেন। বিনিময় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

'খাযানাতুর রেওয়ায়েত' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, ইমাম আবু হানীফা রহ. আপন সন্তান হাম্মাদকে একজন শিক্ষকের নিকট অর্পণ করলেন সন্তান যখন الحمد لله শিক্ষা করল, তখন আবু হানীফা রহ. পাঁচশত দিরহাম শিক্ষকের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। শিক্ষক এতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. তা শুনে হাম্মাদকে আর পাঠালেন না। তিনি এর কারণ উল্লেখ করলেন যে, এই শিক্ষকের নিকট কুরআনুল কারীমের কোনো সম্মান নেই।

আবু নসর সিরাজ রহ. একবার মাহে রমযানে বাগদাদ নগরীতে তাশরীফ নিলেন। তাঁকে লোকেরা মসজিদে এক নির্জন কুঠুরিতে স্থান দিল এবং দরবেশগণের আমীর নিযুক্ত করল। তিনি ঈদ পর্যন্ত দরবেশগণের ইমামতী করলেন এবং কুরআনুল কারীম পাঁচবার খতম করলেন। খাদেম প্রত্যেক রাতে এসে তাঁর কামরার সম্মুখে একটি করে রুটি রেখে যেত। তিনি রুটি উঠিয়ে এক কোণে রেখে দিতেন। ঈদের নামায বাদ যখন তিনি সফরে গেলেন, তখন লোকেরা কামরার কোণে ত্রিশটি রুটি একত্রিত দেখে খুবই আশ্চর্যবোধ করল।[১]

---

১. আনওয়ারুল আযকিয়া।

উল্লেখ্য, কিছু এলাকায় দেখা যায় যে, অনেক হাফেয সাহেবান এমন আছেন, যারা একই রাতে একাধিক স্থানে তারাবীহ পড়ান ব্যক্তিগত বা দুনিয়াবি উদ্দেশ্য নিয়ে। এমন করা ঠিক না। ফিকহশাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবে এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ফতোওয়ায়ে আলমগীরী-এর লেখা নিম্নরূপ :

إمام يصلي التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال لا يجوز، كذا في محيط السرخسي، والفتوى على ذلك، كما في المضمرات.

একই ইমাম দুই মসজিদে সম্পূর্ণ নামাযে তারাবীহর ইমামতী করা নাজায়েয। যেমন, মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। আর ফতোওয়া এ কথার উপরই।

কিছু হাফেয সাহেব মাহে রমযানে কয়েক খতম দিয়ে থাকেন। এ অবস্থায় মুক্তাদীগণ যদি জামাত ত্যাগ না করে, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি প্রতি খতমে জামাত ত্যাগ করে, তাহলে কিছু ফকিহগণের নিকট মুক্তাদীগণের দ্বিতীয় খতমে সুন্নতের সাওয়াব পাবে না। তবে নফল নামাযের সাওয়াব পাবে। কারণ ইমামের সুন্নত প্রথম খতমেই আদায় হয়ে গেছে। তাই দ্বিতীয় খতম তার বেলায় নফল। আর বাকি অন্যান্য ফকিহগণের দ্বিতীয় খতমেও সুন্নতের সাওয়াব পাবে।

উক্ত মাসআলাটি উস্তাযুল উস্তায জনাব মাওলানা আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ আবদুল হাই লখনবী ফিরিঙ্গী রহ. তাঁর ফতোয়ার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ‘খাযানাতুর রেওয়ায়েত’ নামক গ্রন্থেও এর বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের ইমাম হতে কয়েক স্থানে দেখা গেছে এ মাসআলা নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ ফকিহগণ নাজায়েয বলেছেন। আর অন্যান্যরা জায়েয বলেছেন। এভাবেই ‘নফউল মুফতী ওয়াস্ সায়েল’ নামক গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি হাফেযে কুরআনের লক্ষ রাখা উচিত। সর্ব-সাধারণেরও উক্ত মাসআলাগুলি জানা থাকা বাঞ্ছনীয়।

মোটকথা, মতানৈক্য সংবলিত মাসআলাগুলোর ব্যাপারে অগ্রগণ্য ও শক্তিশালী মতের উপর আমল করাই উত্তম।

উপসংহার

কতিপয় হেদায়েতের বর্ণনা

১. কুরআনুল কারীম হিফয করা যদিও কোনো বয়সের সাথে সম্পৃক্ত নয়, সব বয়সেই হিফয করা যায়, তবু সন্তানদেরকে শৈশবকালে হিফয করানো উত্তম। কারণ ছোটবেলায় হিফয করা পাথরে অঙ্কন করার সদৃশ। এ যুক্তির আলোকেই ফকিহগণ লিখেছেন, 'অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের বিনা ওযূতে কুরআনুল কারীম স্পর্শ করা জায়েয আছে। অধিকাংশ ফিকাহশাস্ত্রের কিতাবে তাই উল্লেখ আছে।

২. হিফয করতে যারা উদ্‌গ্রীব, তাদের নিয়ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হওয়া উচিত। নিজের যশখ্যাতি বা দুনিয়াবি অন্য কোনো স্বার্থে হিফয না করা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে এই হিফয কেয়ামতের দিন নিজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. হাফেযে কুরআনের যেসকল বিষয় অনুসরণীয়, তা যথাযথভাবে পালন করা।

৪. যেসকল বিষয় বিস্মৃতির কারণ, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। আর যেগুলো স্মরণশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক, সেগুলো আঁকড়ে ধরা।

কিছু ওলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে, সে কখনোও ভুলবে না।

مجربات ديربي

اللّٰهُمَّ افتح على فتوح العارفين بحكمتك، وانشر على رحمتك،

وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام.

আর কেউ কেউ বলেছেন, নিম্নোল্লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলো সার্বক্ষণিক পাঠে বিস্মৃতির অবসান ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। مجربات ديربي

كلام قديم لا يمل سماعه * تنزه عن قول وفعل ونيه
به أشتفي من كل داء ونوره * دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي
فيا رب! متعني بسر حروفه * ونور به قلبي وسمعي ومقلتي

৫. প্রতিদিন যত আয়াত হিফয করতে সক্ষম, ততটুকুই হিফয করা। তবে شرعة الاسلام (শিরআতুল ইসলাম) নামক কিতাবে লেখা আছে, প্রতিদিন শুধু পাঁচ আয়াত হিফয করা উত্তম। উক্ত কিতাবের ভাষ্য নিম্নরূপ :

ومن السنة أن يحفظ كل يوم خمس آيات لا يزيد عليها، فإنه أنزل لذلك.

‘প্রতিদিন শুধু পাঁচ আয়াত হিফয করা সুন্নত। এর চেয়ে অতিরিক্ত নয়। কারণ কুরআনুল কারীম এভাবেই নাযিল হয়েছে।’

৬. সবকের শুরুতে এ দুআ পাঠ করে নেওয়া ভালো :

اللّٰهُمَّ أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

৭. হিফয সমাপ্তকারী ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান ব্যক্তির এ দুআ পাঠ করা–

اللّٰهُمَّ نور بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، واطلق به لساني، وقَوِّ به جناني، واسرع به فهمي، وقو به عزمي، بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا ارحم الراحمين.

৮. হিফয করতে যার কষ্ট অনুভূত হয়, এবং মুখস্থ করার পর যার বিস্মৃতি ঘটে, তার নিম্নোল্লিখিত প্রণালীগুলোর উপর আমল করা :

এক. এক বুযুর্গের ঘটনা

তিনি নিজ ছেলেকে হিফয করাতেন আর ছেলে ভুলে যেত। এ কারণে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ তাকে

বলছেন, আপনি الرحمن علم القرآن থেকে بحسبان পর্যন্ত ان علينا جمعه থেকে سنقرئك فلا تنسى পর্যন্ত اقرأ وربك الذى থেকে مالم يعلم পর্যন্ত بيانه থেকে يخفى পর্যন্ত কোনো পাত্রে লিখে ধৌত করা পানি ছেলেকে পান করিয়ে দেন। তাহলে যা শুনবে তাই স্মরণ থাকবে।

অতঃপর তিনি এই স্বপ্ন মোতাবেক কাজ করলেন। ফলাফল তাই বাস্তবে দেখা গেছে, পরবর্তীকালে যা শিখেছে আর বিস্মৃতি ঘটেনি; বরং তার বোধশক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুই. বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে স্মরণশক্তি হীনতা সম্পর্কে অভিযোগ করলে, তিনি নিম্নোক্ত দুআ পড়তে আদেশ দিলেন–

اللّٰهُمَّ إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي
فاعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي، يا من يعلم
خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين
يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير.

তিন. তিরমিযী শরীফে ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একসময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। আলী ইবনে আবু তালিব দরবারে নবুওয়াতে একাকী এসে বলতে লাগলেন, 'আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! কুরআনুল কারীম আমার অন্তর থেকে বের হয়ে যায়, ধরে রাখতে পারি না (এখন কী করণীয়?)।' হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আবুল হাসান! আমি কি তোমাকে এমন কতগুলো বিষয় বলে দেব, যেগুলোর দ্বারা তোমার এবং তুমি যাকে বলো তার উপকার হবে? এবং যা শিখবে তা আয়ত্তে থাকবে?'

হযরত আলী রা. বললেন, 'জি হ্যাঁ, অবশ্যই আমাকে এগুলো বলে দিন।' তখন তিনি বললেন, 'জুমার রাতে যদি সম্ভব হয়, শেষ তৃতীয়াংশে জাগ্রত হও। কেননা এ সময়ে দুআ কবুল হয়। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আপন

সন্তানদেরকে উক্ত সময়েই দুআ করার ওসীয়ত করেছিলেন। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মধ্যম রাতে জাগ্রত হও। তাও যদি অসম্ভব হয়, তবে প্রথমাংশে নিম্নবর্ণিত পন্থায় চার রাকাত নামায আদায় করো। ১ম রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা ও সূরায়ে ইয়াসীন, ২য় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা ও সূরায়ে দোখান, ৩য় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা ও সূরায়ে আলিফ-লাম-মীম সিজদাহ, ৪র্থ রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা ও সূরায়ে মুলক তেলাওয়াত করো। তাশাহহুদ পড়ার পর হামদ ও সানা পাঠ করো, আমার উপর ও পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর দরূদ পাঠ করো। সকল মুমিনীন ও ঈমানের সাথে বিদায় হয়ে যাওয়া ভাইদের জন্য ইস্তেগফার করো। অতঃপর এই দুআ পাঠ করো :

اللّٰهُمَّ ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللّٰهُمَّ بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام، والعزة التي لا ترام! اسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلو على النحو الذي يرضيك عني، اللّٰهُمَّ بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام، والعزة التي لا ترام! اسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن اشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

হে আবুল হাসান! উক্ত নিয়মে তিন, পাঁচ বা সাত জুমা পর্যন্ত চার রাকাত নামায আদায় করো। আল্লাহর হুকুমে তোমার এ দুআ কবুল হবে। খোদার কসম! কোনো মুসলমানই এভাবে পড়লে নিষ্ফল হবে না।

ইবনে আব্বাস রা. শপথ করে বলেন, 'আলী ইবনে আবু তালেব রা. পাঁচ বা সাত জুমার পরে উক্ত মজলিসে আবার হাজির হয়ে আরয করতে লাগলেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম তো আমার অবস্থা এমন ছিল যে, চার বা অনুরূপ কয়েকটি আয়াত শিক্ষা করতাম, আবার যখন মৌখিক অনুশীলন করতাম তখন ভুলে যেতাম। এখন চল্লিশ বা সমসংখ্যক আয়াত শিক্ষা করতে পারি। আর মৌখিক অনুশীলনের সময় মনে হয় কিতাব আমার সম্মুখে রাখা আছে। প্রথমে কোনো হাদীস শোনার পর যদি পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছা করতাম, তখন স্মরণ থাকত না। এখন অনেক হাদীস শোনার পরেও এমনভাবে স্মরণ থাকে যে, বর্ণনা করার সময় কোনো হাদীস ছুটে যায় না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "খোদার কসম হে আবুল হাসান! তুমিই শুধু মুমিন।'"

সংযোজন : কিছু পুস্তিকায় আল্লামা মুনযিরী রহ.-এর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব (প্রেরণা ও ভয়ভীতি সম্পর্কিত অধ্যায়) থেকে এমন একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, যা ধর্মপ্রাণ সকল মুসলমান বিশেষত হাফেয সাহেবদের উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগানের মাধ্যম। এ জন্য সংযোজনমূলক উক্ত বর্ণনাটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

মা'আয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের যেকেউ রাত্রি বেলায় নামায পড়ে, সে যেন জোরে ক্বেরাত পাঠ করে। কারণ তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ নামায আদায় করে ও তার ক্বেরাত শ্রবণ করে এবং আশেপাশে মুমিন জিনও তার পেছনে ইকতিদা করে। তার এই ক্বেরাতের বরকতে নিজ ঘর ও আশপাশ থেকে যাবতীয় সংকীর্ণতা ও দুষ্টু জিন পলায়ন করবে। যে ঘরে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করা হয়, তার মধ্যে একটি নূরানী তাঁবু হয়। যার আলো আকাশবাসী চলার পথের দিশারী, যেমন গভীর সমুদ্রে বা জনমানবহীন পতিত মরুভূমিতে তারকারাজি তোমাদের পথচলার আলোকবর্তিকা। যখন ক্বারী সাহেব ইন্তেকাল করেন, তখন উক্ত নূরানী তাঁবু আর থাকে না। দৃষ্টির অগোচর হয়ে যায়, তখন তারা ক্বারী সাহেবের রূহের সঙ্গে প্রতি আসমানে সাক্ষাৎ ও দরূদ-সালাম প্রেরণ করে। দেহরক্ষী ফেরেশতাগণ তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার জন্য সকলেই ইস্তেগফার করতে থাকেন।

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে তেলাওয়াত করে, তার জন্য এ সময়টি আগামী রাতকে

ওসীয়ত করে ক্বারী সাহেবকে হুবহু ওই সময়ে জাগ্রতকরণ ও তার উপর ঘুম হালকাকরণ সম্পর্কে।

এই ক্বারী সাহেব যখন ইন্তেকাল করেন এবং তার স্বজনগণ তাকে সমাধিস্থ করার প্রস্তুতি নেয়, তখন কুরআনুল কারীম এক সুন্দর রূপ ধারণ করে তার শিয়রে অবস্থান নেয়। কাফন পরিধান করানোর সময় তার বুকে চলে যায়। কবরে রাখার সময় যখন তার বন্ধু-বান্ধব আলাদা হয়ে যায়, তখন মুনকার-নাকীর দুই ফেরেশতা এসে তাকে বসায়। এ সময় কুরআনুল কারীম ক্বারী সাহেব ও ফেরেশতাদ্বয়ের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ কুরআনুল কারীমকে একদিকে সরে যাওয়ার জন্য বলে, যাতে প্রশ্ন করতে পারে। তখন কুরআনুল কারীম বলে, ‘খোদার কসম! কখনো আমি আলাদা হতে পারি না। সে আমার বন্ধু ও অন্তরঙ্গ সাথি, তোমাদের কাছে কোনোক্রমেই তাকে সোপর্দ করতে পারি না। যদি তোমরা কোনো ব্যাপারে আদিষ্ট হয়ে থাকো, তাহলে তা পালন করে নাও আর আমাকে এখানেই থাকতে দাও। তাকে জান্নাতে না নেওয়া পর্যন্ত আমি আলাদা হবো না।’

অতঃপর কুরআনুল কারীম তার সাথিকে দেখে বলে, ‘আমি ওই কুরআন, যাকে তুমি জোরে ও আস্তে তেলাওয়াত করতে, সাথি হিসাবে গণ্য করতে, তাই আজকে আমিও তোমার সাথি, আর আমি যার সাথি আল্লাহও তার সাথি। প্রশ্নোত্তর পর্বের পর তোমার নেই কোনো দুঃখ, বেদনা ও দুশ্চিন্তা।’

অতঃপর মুনকার নাকীর প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ করে চলে যায়। আর শুধু ওই ব্যক্তি আর কুরআনুল কারীম থেকে যায়। কুরআনুল কারীম তাকে বলে, ‘তোমার জন্য আমি নরম বিছানা, উত্তম চাদরের ব্যবস্থা করছি। কারণ তোমার রাত্রিবেলায় ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে আর দিনের বেলায় অসহনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।’ তারপর মুহূর্তের মধ্যেই কুরআনুল কারীম আকাশে উঠে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে ওই জিনিসগুলোর আবেদন করে। তখন এ আবেদন পূরণ করা হয় এবং তার সাথে ৬ষ্ঠ আকাশ থেকে দশ লক্ষ ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। কুরআনুল কারীম কবরে এসে তাকে দুআ দেয় এবং বলে, ‘আমি চলে যাওয়ার পর তোমার কোনো ভয় হয়েছে কি? আমি তোমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর দরবার থেকে আবেদন নিবেদন করে এ সমস্ত উপঢৌকন এনেছি। বিছানা,

চাদর ও তালা-চাবি তোমার জন্য এনেছি, তুমি একটু উঠো, যাতে ফেরেশতাগণ বিছানা বিছিয়ে দিতে পারে।' অতঃপর ফেরেশতাগণ তাকে সসম্মানে উঠিয়ে কবরকে চারশত বছরের দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত করবে ও রেশমের বিছানা বিছিয়ে দেবে।

দুটি প্রদীপ জান্নাতের নূর দ্বারা জ্বালানো হবে। একটি থাকবে মাথার কাছে অন্যটি থাকবে পায়ের কাছে। কেয়ামত পর্যন্ত এ দুটি প্রদ্বীপ আলোকোজ্জ্বল থাকবে। অতঃপর ফেরেশতাগণ তাকে ডান পাশ করে কিবলামুখী শুইয়ে দেবে। জান্নাত থেকে চামেলি ফুল এনে দেবে। ফেরেশতাগণ চলে যাবে। এরপর শুধু কুরআনুল কারীম এবং ওই ব্যক্তি থেকে যাবে। তখন কুরআনুল কারীম তাকে জান্নাত থেকে একজাতীয় ফুল এনে তার নাকের সম্মুখে রাখবে। সে এই ফুল থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সুঘ্রাণ আহরণ করতে থাকবে।

এদিকে কুরআনুল কারীম এসে একজন দয়ালু পিতার মতো তার গৃহের যাবতীয় খোঁজখবর নেবে। তার কোনো সন্তান যদি কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করে, তবে তাকে সুসংবাদ দেবে। আর যদি সন্তান অবাধ্য ও নাফরমান হয়, তবে তার জন্য আত্মশুদ্ধি ও নেককার হওয়ার দুআ করতে থাকবে।

সমাপ্ত

পাঠকের পাতা

আমাদের প্রকাশিত আরো কিছু বই

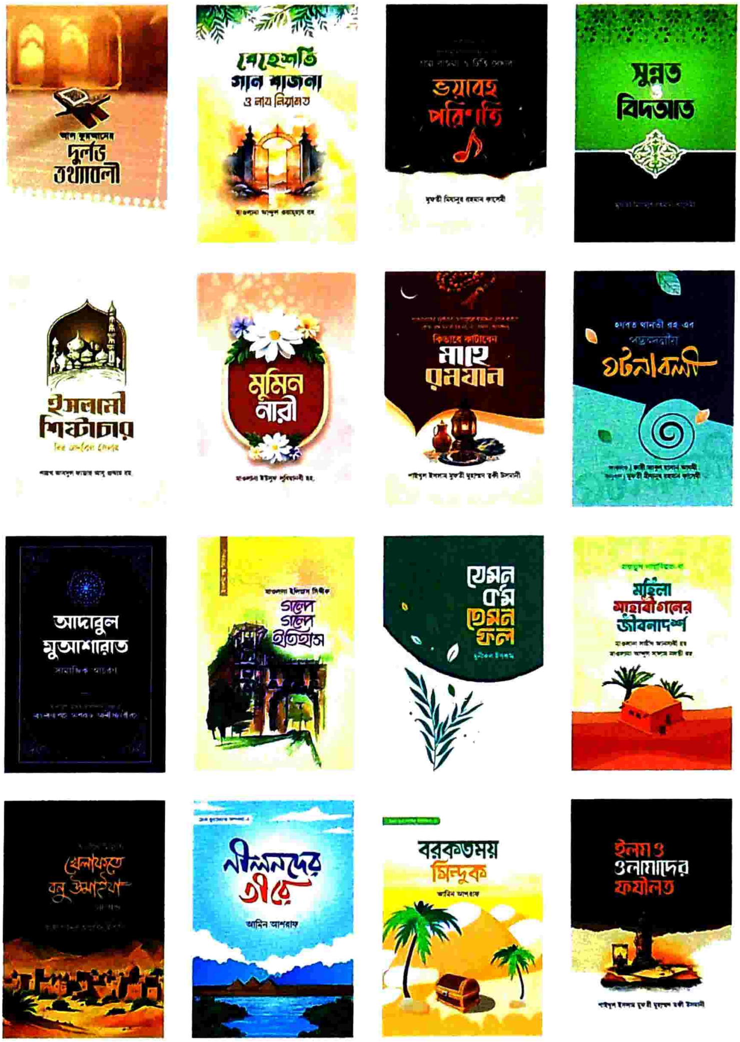

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

১/১১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৯৭৫-০০৯৮২৪, ০১৭৫৩-১৮০৫৫৫

cover : muhareb mohammad 01600187761